চিরবান্ধবী

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির

কাহিনী রচনা করেছেন—

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী ও

শ্রীকিরীটিকুমার পাল

প্রচ্ছদপট ও রঙিন পুস্তনী এঁকেছেন—

শ্রীমনোজ বসু

প্রচ্ছদপট আবরণী এঁকেছেন—

শ্রীবলাইবন্ধু রায়

—পরিকল্পনা করেছেন—

শ্রীসত্যনারায়ণ দে
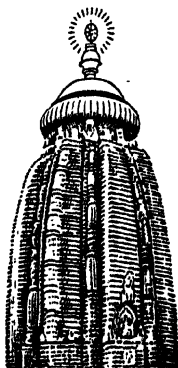
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির

দিনের আলো তখনো উজ্জ্বল হয়নি। শুকতারার জ্বলজ্বলে প্রভাকে নিষ্প্রভ ক'রে পূর্ব্বাশায় বর্ণ-বৈচিত্র্যের ছটা সুরু হয়েছে এমন সময় ট্রেন এসে থামলো স্টেশনে।

সঙ্গে-সঙ্গে হুলুধ্বনি আর শাঁখের শব্দে দিগন্ত মুখরিত ক'রে গ্রামের যেসব মেয়েরা মাঙ্গলিক-উপাচার নিয়ে নব বর-বধূকে বরণ ক'রে নেবার জন্যে কামরার সামনে এসে ভিড় ক'রে দাঁড়ালো, তাদের জন্যে সুব্রতকে বাধ্য হয়েই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো।

এই স্বল্প-জনতার কিছু দূরে সেডের নীচে থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে যে মেয়েটি একাগ্রদৃষ্টিতে সেই কামরার দিকে তাকিয়ে আছে,—আলো-আঁধারের অল্প আবছায়ায় তাকে দেখে সুব্রত চমকে উঠলো—কল্যাণী নাকি! রাত্রিশেষে হিমেল-উষার এই

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে এতটা পথ হেঁটে এসে তার বোন্ কল্যাণী তাকে বাবার খবর জানাতে এসেছে, এও কি সম্ভব? না না, কল্যাণী তো আছে তার শ্বশুরবাড়ীতে।

সন্দেহ-দোলায় দুলতে-দুলতে তাড়াতাড়ি সুটকেশটা হাতে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে পড়ে সুব্রত। তারপর এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির কাছাকাছি পৌঁছেই থম্‌কে থেমে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফ্যালে। না, ও কল্যাণী নয়। কল্যাণীর মতই লাবণ্যময়ী উদ্ভিন্নযৌবনা একটি তরুণী সেই কামরার দিকে অনিমেষ লুব্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে এখনো সেইরকম দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ওর চোখে অশ্রু কেন? বর-বধূ বরণের এই মাঙ্গলিক-অনুষ্ঠানের শুভক্ষণে ওর ওই জলভরা চোখের ব্যথাতুর দৃষ্টিতে যে আকুল আবেদন ফুটতে না পেরে ওকে ভাববিহ্বল ক'রে তুলেছে, তার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করবার সময় এখন সুব্রতর নয়।

কাছেই সেডের নিচে সিমেণ্ট-করা বেঞ্চে বিষণ্নমুখে যে বৃদ্ধাটি গালে হাতে দিয়ে ব'সে ঐ মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে আছেন, খুব সম্ভব তিনি ওর আত্মীয়াই হবেন। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কি কথা ক'য়ে প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়ে পড়লো সুব্রত। তারপর পায়ে-চলা সরু গ্রামের পথ ধ'রে হাঁটতে সুরু করলে। এইভাবে দশ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে ওকে ওর গ্রামে পৌঁছোতে হবে। কত আশা-আশঙ্কাভরা মন নিয়ে যে সুব্রত চলেছে তা ওই জানে। গতদিনের কত কথাই যে ভিড় ক'রে ঠেলে উঠছে মনে...

চিরবান্ধবী

সুব্রত ভাবছে :

বি-এ পাস করলেই ভালো চাকরি পাওয়া যাবে—মনের এ দৃঢ়বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত হলো সসম্মানে গ্র্যাজুয়েট হবার পর থেকেই। তখন থেকেই চিন্তা হলো শুধু চাকরি আর চাকরি। এই চাকরি পাবার আশায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অক্লান্ত পরিশ্রমে ঘুরে-ঘুরে বহু আত্মীয়-অনাত্মীয়দের দরজায় ধন্না দিয়ে নিরাশ হয়ে, কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে-দেখে অনেক-অনেক দরখাস্ত ক'রে আর দেশ-বিদেশের কেরানী-বন্ধুদের কাছে নিজের দুরবস্থার কথা পত্রে জানিয়েও কোথাও কোনো আশা না পেয়ে যখন ও হতাশ হয়ে পড়েছিল, সেইসময় হাজারীবাগ থেকে এক বন্ধু এক অফিসে 'ইণ্টারভিউ' দেবার জন্যে ওকে ডেকে পাঠালে। তার পত্র পেয়েই ছুটেছিল ও হাজারীবাগে, তারপর বন্ধুর চেষ্টায় আর সুপারিশে একটি অল্প-বেতনের কাজে বাহালও হয়েছিল, কিন্তু একমাস যেতে-না-যেতেই সেখানে খবর পৌঁছোলো—বাবার খুব অসুখ, ওকে বাড়ী চলে আসতে হবে।

সেই পত্রখানি দেখিয়ে ও সাহেবের কাছে কিছুদিনের ছুটি চেয়েছিল, কিন্তু কাজে ভর্ত্তি হতে-না-হতেই ছুটির প্রার্থনা সাহেব মঞ্জুর করেনি তাই বাধ্য হয়ে কাজে ইস্তফা দিয়ে ওকে ফিরে যেতে হচ্ছে ওর গ্রামে। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে?…

ক্রমাগত তিন ঘণ্টা হাঁটার পর সুব্রত গ্রামে এসে পৌঁছোলো।

মনোহর মিত্রের খুব অসুখ। শিমুরালী থেকে এসেছে মেয়ে কল্যাণী আর জামাই নবগোপাল। সুব্রত বাড়ীতে ঢুকতেই বৃদ্ধা পিসীমা কেঁদে উঠলেন।…অসুস্থ বাপকে বাড়ীতে একা ফেলে রেখে সুব্রতর যে হাজারীবাগ চলে যাওয়া মোটেই উচিত হয়নি এই কথাটা বার-বার শোনাবার পর শেষে জানালেন, ভাগ্যে মেয়ে-জামাই এসে পড়েছিল তাই রক্ষে, নইলে কি যে হতো তার কল্পনাও তিনি করতে পারেন না।

পিসীমাকে আশ্বস্ত ক'রে সুব্রত ঘরে ঢুকে বাবার কাছে গিয়ে বসলো।

ছেলেকে হাতের কাছে পেয়ে রুগ্ন মনোহর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আর্দ্রকণ্ঠে বললেন, "তুমি এসেছো সুব্রত?"

কোঁচার খুঁটে চোখ মুছতে-মুছতে সুব্রত বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আপনার একি চেহারা হয়েছে? মাত্র একমাস আগে আপনাকে সুস্থ দেখে আমি চাকরির চেষ্টায় হাজারীবাগে—"

বাধা দিয়ে মনোহর বললেন, "আর সুস্থ। জানোই তো, 'চিন্তার সমান নেই শরীর শোষিকা'।…দারুণ দুশ্চিন্তার ফলেই আমি এইরকম অস্থিচর্ম্মসার হয়ে গেছি বাবা। শরীরের যা অবস্থা এখন আমার, তাতে কোনো কথাই আর চেপে রাখা চলে না—কখন আছি কখন নেই, সব কথা তোমায় জানিয়ে যেতে চাই, নইলে মরেও আমার আত্মার তৃপ্তি হবে না।" একটু দম নিয়ে তিনি আবার বললেন, "একমাত্র

ছেলে তুমি, তোমার প্রতি বাপের কর্ত্তব্য আমি কিছুই ক'রে যেতে পারলুম না একি কম দুঃখ আমার। তোমায় অগাধ জলে ভাসিয়ে আমায় বিদায় নিতে হবে পৃথিবী থেকে। আমি—আমি—"

কথা কইতে বাবার কষ্ট হচ্ছে দেখে সুব্রত বললে, "বেশ তো, বলবেন আমায় যা বলবার আছে আপনার। আগে একটু সুস্থ হোন্, তারপর ধীরেসুস্থে সব কথাই শুনবো আমি। এসেছি যখন, তখন আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি তো আর কোথাও যাচ্ছি না আপনাকে ছেড়ে।"

"কিন্তু আমার যে ডাক এসেছে। তোমাদের ছেড়ে এবার যে আমাকেই চলে যেতে হবে বাবা। এখন সব কথা খুলে না বললে আমার যে আর বলা হবে না।"

রুগ্ন বৃদ্ধ পিতাকে আর বিরক্ত করা উচিত নয় ভেবে সুব্রত চুপ ক'রে রইলো।

অতি ধীরে দম নিয়ে-নিয়ে মনোহর বলতে লাগলেন :

...এ বাড়ী, এই সাতপুরুষের ভিটে তিনি মেয়ের বিবাহের সময় পাঁচ হাজার টাকায় জমিদার যতীন্দ্রনাথ বসুর কাছে মাত্র এক বছরের কড়ারে বন্ধক রেখেছিলেন, সে-মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর জমিদারের তরফ থেকে যথাসময়ে তাগিদ আসা সত্ত্বেও তিনি আসল বা সুদ-বাবদ একটি কপর্দ্দকও দিতে না পেরে অনেক অনুনয়-বিনয় ক'রে জমিদারের কাছ থেকে ঋণের

মেয়াদ আরো যে দু'বছর বাড়িয়ে নিয়েছিলেন, সে-সময়ও পার হয়ে গেছে তবু তিনি তার কিছুই কিনারা করতে পারেননি। কিন্তু আর তো সময় প্রার্থনা করা চলবে না। নিরুপায় অবস্থাতেই এবার সবাইকে নিয়ে গাছতলায় আশ্রয় নিতে হবে তাঁকে। এরপর জমিদার আর কোনো আবেদনই গ্রাহ্য করবেন না তাঁর, ইত্যাদি।...

বৃদ্ধ পিতাকে সান্ত্বনা দেয় সুব্রত, "আপনি ভাববেন না বাবা, আগে ভালো হয়ে উঠুন, তারপর যতীনবাবুর কাছে গিয়ে আমি যাহয় একটা ব্যবস্থা ক'রে আসবো।"

পাঁচ হাজার টাকা সুদে-আসলে এই তিন বছরে কত হয়েছে মনে-মনে হিসাব করে সুব্রত।

কেবল কল্যাণীর বিয়ের জন্যেই এ-টাকা খরচ হয়নি। সুব্রতকে লেখাপড়া শেখাতেও এই টাকার অনেক খরচ হয়ে গেছে। মোট পাঁচ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে, খুচরা সব দেনা মিটিয়ে দিয়ে তিনি আশা করেছিলেন, সুব্রত বি-এ পাস করলেই ভালো চাকরি পাবে, তখন ওর মাইনের টাকা থেকে কিছু-কিছু সঞ্চয় ক'রে তিনি ক্রমে-ক্রমে ঋণ পরিশোধ ক'রে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন।

হায় রে দুরাশা! কোথায় চাকরি? গ্র্যাজুয়েট হবার পর এই দীর্ঘ চার বছরের মধ্যে সুব্রত সাময়িকভাবে মাঝে-মাঝে চাকরি ক'রে যৎসামান্য উপার্জ্জন করলেও, বেকার অবস্থাতেই তার কেটে গেছে বাকি দিনগুলো।

চিরবান্ধবী

জমিদার যতীন্দ্রনাথ বসু তাঁর অসামান্য প্রতিভায় ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ রোজগার ক'রে এই ভূসম্পত্তি ক্রয় করবার পর মাত্র কয়েকবার এই গ্রামে এসে অস্থায়ীভাবে পাঁচ-সাতদিন ক'রে বাস ক'রে গেছেন, প্রজাদের সঙ্গে ভালো ক'রে পরিচয় হয়নি তাঁর। ম্যানেজার রতন দাস এখানে থাকেন, তিনিই সব দেখাশুনা করেন।

সে আজ বিশ বছর আগেকার কথা।

জমিদারী কেনবার পর এই গ্রামে এসে নতুন ক'রে পরিচয় হয়েছিল মনোহর মিত্রের সঙ্গে যতীন্দ্র বসুর। বহুকাল পরে মুর্শিদাবাদ জেলার একটি স্কুলের সহপাঠি দুই বন্ধুর মিলন হয়েছিল এই কাশিমপুরে।

কিছুক্ষণ স্বাগত-সম্ভাষণের পর বন্ধুর দুরবস্থার কথা শুনে ক্ষুব্ধ যতীন্দ্রনাথ, মনোহরকে নিজের ষ্টেটে একটি কাজ দিয়েছিলেন, যাতে তিনি সম্মানের সঙ্গে সেই কাজ ক'রে নিজের অবস্থা পরিবর্ত্তন ক'রে সংসারে আবার সচ্ছলতা আনতে পারেন। কিন্তু 'অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়' কথাটা প্রতি বর্ণে ফলে গেল তাঁর নিজের অবিমৃশ্যকারিতার ফলে। স্বাবলম্বনপ্রয়াসী মনোহর বেশীদিন জমিদারী সেরেস্তায় চাকরি করতে পারলেন না, স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করবার জন্যে তিনি তাঁর অস্থাবর-সম্পত্তির কিছু খুইয়ে যে ব্যবসা খুললেন, তাঁর দুরাকাঙ্ক্ষ মনের চঞ্চলতায় সেই বহুকষ্টে সংগৃহীত অর্থের একটি কপর্দ্দকও আর অবশিষ্ট রইলো না।

কারবার উঠে যাবার পর নিঃস্ব রিক্ত মনোহর একেবারে ভেঙে পড়লেন।

আট বছর আগে।

কোনোরকমে সুব্রতকে ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়াবার খরচ যোগাবার পর সে যখন উচ্চসম্মানের সঙ্গে স্কুলফাইনাল-পরীক্ষায় পাস ক'রে 'লেটার' পেয়ে অর্থাভাবে কলেজে ভর্ত্তি হতে পারছিল না, সেইসময় যতীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার তাঁর জমিদারী পরিদর্শন করতে এসেছিলেন কাশিমপুরে।

তারপর বন্ধুর সঙ্গে একদিন দেখা ক'রে বর্ত্তমানে তাঁর নিরবলম্ব অবস্থার কথা শুনে, ব্যবসা-করার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যে তাঁকে ধিক্কার দিলেও তিনি বন্ধুপুত্রের সব ভার গ্রহণ করেছিলেন, এবং সুব্রতকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কলেজে ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে তাকে নিজের বাড়ীতে না রেখে, শ্যামবাজারের এক বোর্ডিং-হোষ্টেলে রেখে দিয়েছিলেন।

হোষ্টেলে থেকে দারুণ অধ্যবসায়ে পড়াশুনা করার সময় ছুটির দিনে মাঝে-মাঝে যতীন্দ্রনাথের বাড়ী থেকে সুব্রতর নিমন্ত্রণ আসতো, কৃতজ্ঞতাভরা মন নিয়ে সে প্রতিপালক পিতৃবন্ধুর আমন্ত্রণ রক্ষা করতে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখা করবার সময় দু'একটি কথাবার্ত্তার আদান-প্রদানও হয়েছে তাঁর সঙ্গে তার, স্বল্পভাষী গম্ভীরপ্রকৃতি সেই লোকটির স্বস্তিবাচনে গলে গিয়ে লজ্জিত-বিনয়ে মাথা নত ক'রে সুব্রত শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

করেছে তাঁর পায়ে। কি-কি গুণ থাকলে সামান্য অবস্থা থেকে মানুষ এত বড় হতে পারে, তাঁকে দেখে সে ভাবতে শিখেছে। রিক্তহাতে এসে প্রার্থীরা কেউ বঞ্চিত না হয়ে অন্তত কিঞ্চিৎ পেয়েও আনন্দাশ্রুসিক্ত-চোখে ভগবানের উদ্দেশে তাঁর কল্যাণ কামনা করতে-করতে ফিরেছে, এসব সুব্রত নিজে দেখেছে। তাই তার আশা—বাস্তুভিটার জন্য অন্তত আরো কিছুদিন সময় প্রার্থনার আবেদন যতীন্দ্রনাথ অগ্রাহ্য করবেন না।

*

* *

নিত্য অভাব-অনটনের সংসার।

শ্বশুরমশাইকে কিছু সুস্থ হতে দেখে নবগোপাল কল্যাণীকে পিত্রালয়ে রেখে চলে গেছে। কল্যাণীর অতিবৃদ্ধা পিসীমা মোক্ষদা-ই বহুকাল হতে বিপত্নীক-সহোদরের সংসারের গৃহিণী। সুব্রতর মা মারা যাওয়ার পর অনেকের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও মনোহর দ্বিতীয়বার বিবাহ না ক'রে এই ভগ্নিটির সাহায্যেই কোনোরকমে ছেলে-মেয়ে দুটিকে মানুষ ক'রে তুলেছেন।

...বি-এ পাস-করা ছেলে একটা চাকরি পেলেও এ-কষ্টের কিছু লাঘব হতো, কিংবা তার ভবিষ্যৎ ভেবে তাকে শিক্ষিত ক'রে তোলবার চেষ্টা না ক'রে তাকে হাতের-কাজ শিখিয়ে

গড়ে তোলবার চেষ্টা করলে, ছোট-কাজ মনে করতে হয়তো এখন তার বিবেকে বাধতো না, কিন্তু এ 'দুয়ের-বার' ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় শূন্যে-দোদুল্যমান ছেলেকে নিয়ে এই দারিদ্র্য বরণ ক'রে আর তাঁর বেঁচে থেকে লাভ কি—মনোহর শুয়ে-শুয়ে এইসব ভাবছিলেন···

বাইরে বারান্দায় পা ছড়িয়ে মোক্ষদা বিলাপ করছিলেন, "পোড়া যম এত লোককে নেয়, আর আমার বেলায় একেবারে কালা হয়ে মরেছে। এত যে ডাকছি, ওরে মুখপোড়া যম, আর কেন, এবার আমায় ডেকে নে। তা চুলোমুখো যম যদি একটিবারের জন্যেও সে-কথা কানে তোলে···"

রুগ্ন মনোহরের চিন্তায় বাধা পড়ে। রুক্ষকণ্ঠে তিনি ঘর থেকেই ব'লে ওঠেন, "তুমি থামো দেখি দিদি! দিনরাত শুধু প্যান্‌পেনিয়ে কান্না আর যমের সঙ্গে একতরফা ঝগড়া! বলি, যম কি তোমার ডাক শুনে সামনে এসে কোঁদল করবে, না তোমার গালমন্দতে চটে গিয়ে তোমার মাথায় ঘা মারবার জন্যে তার যমদণ্ড তুলবে? মেয়াদ যেদিন শেষ হবে সে আপনিই আসবে, তার জন্যে এখন থেকে আর সাধ্যসাধনা করতে হবে না। তার চেয়ে বরং পারের কাণ্ডারীকে ডাকো, যিনি তোমায় বৈতরণী পার ক'রে দেবেন।···আঃ, কি মুস্কিলেই যে পড়েছি তোমাকে নিয়ে···"

মনের আবেগে আরো কি সব বলতে যাচ্ছিলেন মনোহর, এমন সময় এসে পড়লেন যতীন্দ্রনাথের ম্যানেজার রতন দাস।

থেমে গেলেন মোক্ষদা। ত্রস্তে উঠে দাঁড়ালেন শীর্ণ মনোহর। রতন দাসের আসার কারণ বুঝেও সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে বললেন, "আসুন আসুন রতনবাবু··· ওরে কল্যাণি, মোড়াটা একটু এগিয়ে দিয়ে যা তো মা।"

"থাক্ থাক্, এই দুর্ব্বল শরীরে আর আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না মিস্তিরমশাই, বসুন আপনি।" ব'লে নিজেই মোড়াটা টেনে নিয়ে বসলেন তিনি।

বাধ্য হয়েই বিবর্ণ মনোহরকে বিছানার ওপর বসতে হলো। তারপর স্বাগত-কুশলাদি শেষ হতেই রতন দাস কাজের কথা পাড়লেন :

"বাবু আজ আমাকে আপনার এখানে আসবার জন্যে পত্র লিখেছেন মিস্তিরমশাই। আপনাকে একটা জরুরী কথা জানাবার হুকুম আছে আমার ওপর, আর সে-কথাটা আমি একটু গোপনেই বলতে চাই।"

ম্লান হেসে মনোহর বললেন, "তা আমি আপনাকে দেখেই বুঝেছি। জরুরী কথা না থাকলে আর আপনি হঠাৎ এখানে আসবেন কেন? তবে গোপনে বলবার কোনো প্রয়োজন হবে না, কারণ এখানে দিদি ছাড়া আর কেউ নেই, আর উনি সবই জানেন, তাছাড়া উনি কানেও শোনেন খুব কম। যত খুশি আপনি আমায় অপমান করতে পারেন, দিদি তার কিছুই শুনতে পাবেন না। তবুও আপনার এই ভদ্রতার জন্যে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

"অপমান !"

রতন দাস জিব কামড়ে হাতজোড় ক'রে বললেন, "ছি ছি, একি কথা বলছেন মিত্তিরমশাই, অপমান করতে আমি আসবো কেন আপনাকে ? আমি আজ এসেছি যা বলতে সে-কথা শুনলে আপনি খুশীই হবেন।" ব'লে ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই জেনেও মোড়াটা আর-একটু বিছানার কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে তিনি চাপাগলায় বললেন, "মানে, আপনি যাতে ঋণমুক্ত হয়ে এই সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারেন, আমি সেই সুখবরই দিতে এসেছি আপনাকে—বুঝলেন ?"

কিছু না বুঝলেও রতন দাসের মুখে এই আশার বাণী শুনে মনোহরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে···স্তিমিত চোখের দৃষ্টি চক্‌চক্ করে···ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, "কি ব্যাপার বলুন তো ? সত্যি, আপনার এ হেঁয়ালির কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, বলবো বৈকি। বুঝিয়ে বলবার জন্যেই তো এত সকালে ছুটে এসেছি আপনার কাছে। আজ আমি এসেছি, এরপর আপনার মতটা—মানে, আপনার আপত্তি নেই শুনলেই স্বয়ং বাবু আসবেন আপনার সঙ্গে কথা কইতে—মানে, আপনাকে আর কষ্ট ক'রে কোর্ট-কাছারিতে ছুটতে হবে না। বুঝেছেন ?"

মনোহর বললেন, "বুঝেছি। শমন চেপে ডিক্রীজারী ক'রে তিনি স্বদলবলে এখানে এসে আমায় ভিটে-ছাড়া করবেন।

কিন্তু—কিন্তু তিনি কি এতটা অকরুণ হবেন আমার ওপর ?”

মৃদু হেসে রতন দাস বললেন, “আসল কথা আপনি কিছুই বোঝেননি মিত্তিরমশাই, মানে, বুঝেছেন ঠিক একেবারে উল্টো। যাকে বিপরীতবুদ্ধি বলে আরকি। ভিটে-ছাড়া করবার ইচ্ছে থাকলে বাবু অনেককাল আগেই করতে পারতেন। মানে, আপনার দুঃখের দিনে তিনি তাহ'লে তাঁর ষ্টেটে চাকরিও দিতেন না, আর আপনার ছেলেকে শিক্ষিত ক'রে গড়ে তোলবার ভারও নিতেন না তিনি। তারপর ধরুন, দু-দুবার ঋণের মেয়াদের কড়ার উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরও একটি পয়সা উসুল না পেয়ে যিনি আপনাকে ভিটেতে থাকবার উদারতা দেখিয়েছেন, তাঁকে—আপনার সেই বন্ধুকে আপনি এতটা হীন ভাববেন না। তবে এর মধ্যে একটা কথা আছে। মানে, এর মূল হচ্ছি আমি। এ-গ্রাম আমার জন্মভূমি না হলেও বহুকালযাবৎ এখানে বাস করার দরুণ আপনার সম্বন্ধে সব কথাই আমি জানি, আর জানি বলেই আপনার মত সরল ধর্ম্মভীরু লোকের যাতে কোনোরকম অনিষ্ট না হয় সেই চেষ্টাই বরাবর ক'রে আসছি, তাই তার সুফল ফলেছে এতদিনে। মানে, এবার আমি আপনার ভাগ্য ফেরবার যে-কথা শোনাবো আপনাকে, সেটা হয়তো স্বপ্নে দেখা যায়, কিন্তু বাস্তবে তার কল্পনাও মাথায় আসে না কারুর। আপনি বলবেন সেটা এমন কি কথা, আমি বলবো, হ্যাঁ, সেটা এত আশ্চর্য্য কথা যে,

তা শুনে আপনি বিশ্বাস করবেন না, অথচ সে-কথাটা সত্যি। শুনুন তবে। আমি এমন একটা কায়দায় তাঁর মন ভিজিয়েছি যে, ভিটে ত্যাগ করার দুঃখ ভোগ না ক'রে তাঁর বিপুল সম্পত্তি ভোগ করবার জন্যে অনুরোধ করতে আসবেন তিনি আপনাকে। মানে, আপনি অনুমতি করলেই আপনার ছেলে হবেন রাজা, আর আপনি হবেন রাজার বাপ। তখন আমায় স্মরণে বা চরণে রাখতে কৃপণতা করবেন না এইটুকুই আমার মিনতি আপনার কাছে।"

অস্পষ্ট ইঙ্গিত হলেও রতন দাসের বক্তব্যের তাৎপর্য্য কিছু-কিছু আন্দাজ করা যায়, কিন্তু বিশ্বাস করা চলে না। তবুও এই 'সন্দেশবহ' যে সংবাদ এনেছেন তাতে ধন্যবাদের সঙ্গে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত ভেবে মনোহর সজলচোখে তাঁর শীর্ণ হাত দু'খানা দিয়ে রতন দাসের একটা হাত চেপে ধ'রে বললেন, "তা যদি সম্ভব হয় তো শুধু আপনার শুভেচ্ছার ফলেই হবে এ আমার চিরদিন মনে থাকবে। কিন্তু রতনবাবু, এবার একটু সোজা কথায় আসুন। আপনি কি সত্যিই সুব্রতর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন আজ আমার কাছে? পরিহাস ক'রে আমার যাত্রাপথ যে অশ্রুপিচ্ছল করতে আসেননি এ-বিশ্বাস আমি করতে পারি তো?"

রতন দাস কণ্ঠস্বর খাদে নামালেন, বললেন, "খুব পারেন। মানে, বাবু এবার মেয়ের বিয়ে দিতে চান এবং অন্দরে গিন্নীমা আপনার ছেলে সুব্রতকেই তাঁর একমাত্র মেয়ের

উপযুক্ত পাত্র ব'লে পছন্দ ক'রে বাবুকে তাগিদে-তাগিদে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছেন, আর বাইরে সব সময় এই কথা নিয়ে আমি তো লেগেই আছি। তবে, বাবুর নেকনজর যে বরাবর আপনার ছেলের ওপর আছে সে-কথা আমার চেয়েও আপনি ভালো করেই জানেন। কাজেই, এতদিনে বাবুর খেয়াল হয়েছে যে, আর বিলম্ব না ক'রে এ শুভকাজটা তিনি শীগগিরই শেষ ক'রে ফেলবেন। এখন আপনার মতটা পেলেই বিয়ের ফর্দ্দ ফাঁদবার হিড়িক্ লেগে যাবে। আপনার পাতা-চাপা বরাত মিত্তিরমশাই, মানে, যে ক'দিন দুর্ভোগ ছিল আপনার তার শেষ হয়েছে, এখন সেখানে জ্বলজ্বল করছে কি জানেন? জ্বলজ্বল করছে নতুন ক'রে মেরামত-করা আপনার এই এঁদোপড়া বাস্তুভিটে···বাবুর বিরাট জমিদারী···পাঁচ-সাতটা কয়লার খনি···কলকাতার সেই টাকার আঁচে উথলে-ওঠা-ব্যবসার নরম-গরম গদি, আর এসবের মালিক আপনার হীরের টুক্‌রো ছেলের হাসিভরা মুখের পালিস-করা জলুস। এ সুযোগ মানুষের জীবনে দৈবাৎ আসে মিত্তিরমশাই। দেবতা আপনার ওপর প্রসন্ন হয়েছেন। যা 'আপ্‌সে আতা' তাকে আস্‌তে দিন, হেলা করবেন না। মানে, এখন আপনি রাজী আছেন শুনলেই তিনি সামনের সপ্তায় নিজে এসে কথা পাকা ক'রে যাবেন।"

রতন দাসের মুখে আকাশের চাঁদ হাতে পাবার এইসব আশার কথা শোনার পর অশ্রুজলে বিগলিত হয়ে মনোহর

শুধু বলতে পারলেন, "কিন্তু—কিন্তু আমি গরীব···আমি তাঁর কাছে ঋণী···তিনি দয়া করলেও, আমি কি তাঁর সম্মান রক্ষা করতে পারবো রতনবাবু?···এত সুখ কি আমার কপালে লেখা আছে?"

সাফল্যের হাসি হেসে রতন দাস বললেন, "খুব আছে। নিজের কপালের লেখা কি কেউ নিজে দেখতে পায়? আমি দিব্য-চোখে দেখতে পাচ্ছি, খাঁটি সোনার অক্ষরে-লেখা 'জোর-বরাত' ঝক্‌মক্ করছে আপনার ওই চওড়া কপালে। আপনি ভাবছেন কেন মিত্তিরমশাই! মানে, তখন কি আর আপনি গরীব থাকবেন? 'আলিবাবা'-নাটকের ভাষায় বললে বলা চলে—'তখন কি আর মুড়ি খাবেন বস্তা-বস্তা? তখন খালি খাবেন বাদাম-পেস্তা'·· "

ব'লে নিজেকে তিনি একজন রসিক-বক্তা ভেবে, মনস্কামনা পূর্ণ হবার পর এখানে আর অপেক্ষা করা অনুচিতবোধে হাসতে-হাসতে উঠে পড়লেন।

যাবার সময় ব'লে গেলেন, "এতকাল পরে দুঃখের দশা এবার কাটবে আপনার। কাটবে কেন, রাজী যখন হলেন তখন ও কেটেই গেছে জেনে রাখুন, আর এই সুসংবাদটা বাবুকে দিয়ে তাঁর হাসিমুখের 'ধন্যবাদ' পেয়ে ধন্য হবার জন্যে এখান থেকে ধুলোপায়ে একেবারে তাঁর শ্রীমন্দিরে উঠে তাঁকে দর্শন ক'রে আমি এখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিগে। জয়জয়কার হোক্ আপনার। আচ্ছা নমস্কার।"

রতন দাস চলে গেলেন।

দু'হাতে মুখ ঢেকে হাঁটুর ওপর মাথা রেখে মনের-চোখে মনোহর ভবিষ্যতের যে রঙিন দৃশ্য দেখতে লাগলেন, ওই অবস্থার ভুক্তভোগী ভিন্ন দিনের আলোয় বাস্তবে তা খোলা-চোখে কেউ দেখতে পায় না।

*

*   *

দিনের শেষে সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে এলো সুব্রত।

অনেক চেষ্টার ফলে ও বাগান-পুকুর বিক্রির ব্যবস্থা ক'রে এসেছে, এবার বাবা একটু সুস্থ হলেই তাঁকে নিয়ে গিয়ে দলিলটা রেজেষ্ট্রী করাতে পারলেই টাকা পাবে, আর সেই টাকা থেকে সুদ-বাবদ কিছু দিয়ে মহাজন যতীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আরো কিছুদিনের সময় প্রার্থনা করবে।

দিনকয়েক আগে পিসীমা শয্যা নিয়েছেন, সংসারের সব ভার পড়েছে এখন কল্যাণীর ওপর।

মনোহর তখনই ছেলেকে কিছু না ব'লে, পরে বলবেন ঠিক করেছিলেন, কিন্তু সব ফাঁস ক'রে দিলে কল্যাণী।

শাকের ঘণ্ট আর নিরামিষ ঝোল দিয়ে দাদাকে ভাত খেতে দিয়ে কল্যাণী বললে, "বেশীদিন আর এ-কষ্ট সইতে হবে না দাদাভাই, এতদিন পরে বোধকরি ভগবান আমাদের দিকে

মুখ তুলে চেয়েছেন। তুমি বাড়ী থাকো না, বাবার আর পিসীমার দুঃখ দেখে যে কি কষ্ট হয় আমার তা আমিই জানি। কি ক'রে যে দিন চলছে…"

ভাতের গ্রাস মুখে তুলে সুব্রত বললে, "তা তো ঠিকই। এই ছাখ্ না, ভগবানের দয়াতেই কিছু টাকা পাবার ব্যবস্থা হলো, তার মধ্যে আজ পঞ্চাশটা টাকা নগদ এনেছি, বাকিটা দিনকয়েকের মধ্যেই পাওয়া যাবে। আপাতত এই টাকা থেকে সংসারের দরকারী জিনিসগুলো এনে তো ফেলি, তারপর পরের ভাবনা পরে ভাবা যাবে। কিন্তু আজ সকালে যে বললি, ঘরে একদানা চাল নেই, তবে রান্না হলো কি ক'রে ?"

"হলো তুমি ওবেলা খাওনি ব'লে। নইলে খেতে হতো শুধু 'দন্তরস'!"…বলেই সে হেসে উঠলো। অপর্যাপ্ত তার হাসি। তেমন হাসি কেউ দুঃখের দিনে হাসতে পারে না।

খাওয়া স্থগিত রেখে সুব্রত ম্লানচোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো এই সরলা বোন্‌টির মুখের দিকে, তারপর বললে, "না, কালই চিঠি লিখবো নবগোপালকে, পত্রপাঠ এসে সে যেন নিয়ে যায় তোকে।"

সহসা হাসি বন্ধ হয়ে যায় কল্যাণীর। ব্যথিত-চোখে দাদার মুখের দিকে চেয়ে সে বলে, "কেন দাদাভাই, কি এমন অপরাধ করেছি আমি তোমার কাছে যে, আমায় বিদায় ক'রে তুমি তার শাস্তি দেবে ?"

ধরাগলায় সুব্রত বলে, "অপরাধ তোর নয় কল্যাণী, এসব আমাদের অদৃষ্টের ফের। আমাদের অক্ষমতার জন্তেই এখানে থাকলে তুই এরপর না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবি। সেখানে বাবুয়ানা না থাক্, খাবার আছে। গোলাভরা ধান, বাটিভরা দুধ আর পুকুরের টাটকা মাছ আছে। খাওয়া অভাবে অন্তত শুকিয়ে মরতে হবে না তোকে।"

কল্যাণী মাথা নাড়ে, ঠোঁটের ফাঁকে মৃদুহাসির তির্যক-রেখা টেনে বলে, "না দাদাভাই, না। এরপর আমাদের কাউকেই আর শুকিয়ে মরতে হবে না। বরং আমরাই কত লোককে খেতে-পরতে দেবো, দেখো।"

ভাতের শেষ গ্রাস মুখে তুলতে-তুলতে সুব্রত বললে, "তুই কি বলছিস্ কল্যাণি ?"

কল্যাণী বললে, "বলছি ঠিকই। বলছি এই যে, এবার তুমি হবে জমিদার, মস্ত বড় ব্যবসাদার, চার-পাঁচটা কোলিয়ারীর মালিক, আর—"

বাধা দিয়ে হাসতে-হাসতে সুব্রত বললে, "আর ওইরকম একটা বিরাট রাজ্যলাভের সঙ্গে রূপকথার সেই রাজপুত্রের বাকি যে-স্বপ্নটা সত্যি হয়েছিল—"

কল্যাণীও এবার দাদার কথায় বাধা দিয়ে বললে, "হ্যাঁ। তোমার ভাগ্যে তাও হবে। দুধেআল্তাগোলা-রঙের চমৎকার একটি সুন্দরী রাজকন্তাও তার সঙ্গে পেয়ে যাবে তুমি। কথাটা এই যে, তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে। বাবার মুখে

এরপর সবই শুনতে পাবে। আমাদের জমিদারের একটিমাত্র সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা বলতে আজ সকালে তাঁর ম্যানেজার এসেছিলেন বাবার কাছে।”

পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুতের শিহরণ জাগে···মুহূর্ত্তের জন্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে সুব্রতর মন···চুপ ক'রে ব'সে থাকে তারপর।

“বিয়ের নাম শুনেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলে দাদাভাই, বিয়ে হ'লে তো এরপর কাউকে চিনতেই পারবে না মনে হচ্ছে। দেখো, বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে ক'রে আমাদের যেন ভুলে যেও না। দেখেছি তো, বিয়ের পর ছেলেরা কিরকম বদ্‌লে যায়! সে ছোট বা বড় বোন্ যেই হোক্, কিংবা ছেলেবেলাকার খেলার সাথী অন্য কোনো মেয়েই হোক্, চোখে দেখেও চিনতে পারে না তখন। মেয়েরা কিন্তু সেরকম নয়। একবার যাদের শ্রদ্ধা-ভক্তির চোখে দেখেছে তারা, জীবনে কখনো ভুলতে পারে না তাদের।”

সুব্রতর মনে হলো, কথাটা সত্যি।···বললে, “সব ছেলের মন তোর কথার সঙ্গে না মিললেও, অনেক ক্ষেত্রে সেরকম দেখেছি বটে। এই সেদিন ষ্টেশনে আমি একটি কুমারী মেয়ের চোখে জল দেখে এত ব্যথা পেয়েছিলুম যে, চিরদিন তার কথা আমার মনে থাকবে। শুনবি কি হয়েছিল সেদিন?”

দারুণ আগ্রহে কল্যাণী ব'লে উঠলো, “শুনবো না আবার?

চলার পথে তোমরা যেসব অদ্ভুত ঘটনা ছাখো, ঘরে ব'সে শোনা ছাড়া আমাদের আর অন্য উপায় কি আছে বলো ?"

সুব্রত বলতে সুরু করলে ঃ

"হাজারীবাগ অফিসে কাজ করবার সময় তোদের কাছ থেকে বাবার অসুখের চিঠি পেয়ে, তারপর ছুটি না পেয়ে আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ষ্টেশনে এসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর পেলুম, ডাউন ডেরাডুন-এক্সপ্রেস। সেই ট্রেনে উঠে নীচে নামতে-নামতে এসে হুগলী-ব্রীজ পার হয়ে যখন নৈহাটি ষ্টেশনে এসে নামলুম তখন রাত চারটে। আমাদের লাইনের গাড়ী তখন পাশের প্ল্যাটফর্মে মজুত ছিল, পনেরো মিনিট পরে ছাড়বে। গাড়ী বদল ক'রে একটা খালি-কামরায় উঠে ব'সে নিজের অবস্থার কথা আর বাবার অসুখের কথা ভাবতে-ভাবতে কোথা দিয়ে কেমন ক'রে সময় কেটে গেছে কে জানে, যখন গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা পড়েছে সেইসময় হন্তদন্ত হ'য়ে বর-ক'নে সমেত একদল বরযাত্রী এসে হৈ-হৈ করতে-করতে আমাদের কামরার দরজা খুলে উঠতেই গাড়ী ছেড়ে দিলে।...

সেই দলটিকে আর বর-ক'নেকে দেখে তাদের বেশ অবস্থাপন্ন বলেই মনে হলো। পরে শুনলুম, তাদের সেকেণ্ড-ক্লাসের টিকিট থাকা সত্ত্বেও সময়াভাবে তারা আমার থার্ডক্লাস কামরায় উঠতে বাধ্য হয়েছে।...

যাক্। তারপর পাত্রপক্ষের লোকেদের মুখে কন্যাপক্ষের

অজস্র সুখ্যাতি আর নানা কথাবার্ত্তার শেষে ভোর পাঁচটায় আমাদের ষ্টেশনে ট্রেন থামতেই, বর-ক'নে নিয়ে বরযাত্রীদের নামবার হিড়িক সুরু হলো আর সঙ্গে-সঙ্গে গ্রামের অনেক মেয়ে বউ ভিড় ক'রে আমার কামরার সামনে এসে উলু দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে এত তাড়াতাড়ি বর-ক'নে বরণ-করা সুরু ক'রে দিলে যে, দরজা খুলে আমি বেরুবার পথ পেলুম না। তখন বাধ্য হয়েই আমায় গাড়ীতে অপেক্ষা করতে হলো, আর সেই ফাঁকে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েই আমি চমকে উঠলুম। বাবার শক্ত অসুখের খবর পেয়ে পাগলের মতন বাড়ী ফিরছি, মনের অবস্থা তখন কিরকম বুঝতেই পারছিস্, আমি দেখলুম, প্ল্যাটফর্ম্মের সেডের নীচে একটা লোহার থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে তুই কাঁদছিস্—"

দাদাকে আর বলতে না দিয়ে কল্যাণী সচমকে ব'লে উঠলো, "আমি ?"

"না না, তুই কেন, শেষে বুঝলুম সেটা আমার মনের ভুল। আগে কথাটাই শেষ করতে দে আমায়!" ব'লে সুব্রত তার আগের কথার জের টেনে এনে বললে, "মেয়েদের 'স্ত্রীআচারপর্ব্ব' শেষ হতেই গাড়ী থেকে নেমে সেই মেয়েটির কাছাকাছি গিয়ে দেখলুম, না, তুই নোস্, সে অন্য মেয়ে। কুয়াশার আবছা-অন্ধকারে দূর থেকে তাকে দেখাচ্ছিলো অবিকল তোর মতন। গাড়ীর জানলা দিয়ে তাকে দেখেই বাবার অসুখের অমঙ্গলের কথাটা এমনভাবে আমার বুকে ধাক্কা

দিলে যে, আমি ভাবলুম, সেই অশুভ সংবাদটা দিতে তুই বুঝি ষ্টেশন পর্য্যন্ত ছুটে এসেছিস্। এটা মনে হলো না, আমি যে আসছি আর এই ট্রেনেই আসছি তা তোরা জানবি কেমন ক'রে, আর জানলেও কোনো মেয়ের পক্ষে দশ মাইল পথ হেঁটে ভোরবেলায় ষ্টেশনে আসা একেবারে অসম্ভব। অবস্থার ফেরে পড়লে মানুষের মনের গতি এইরকম হয় এ আমি অনেক বইয়েও পড়েছি। যাক্ সে কথা।...

তারপর গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা পড়তেই বাঙালী-গার্ড-সাহেবটি আলো ফেলে-ফেলে প্ল্যাটফর্মের কোথায় কি প'ড়ে রইলো দেখতে দেখতে যখন তাঁর কামরায় উঠতে যাচ্ছেন সেই সময় তাঁর হাতের টর্চ্চের আলো সেই মেয়েটির মুখে পড়তেই দেখলুম, মুখখানি তার ঝাম্‌রে উঠেছে, মনের ব্যাকুলতা গ'লে গিয়ে যেন তার চোখ দিয়ে বেরুতে চাচ্ছে। সত্যি, মায়া হলো সেই অবস্থায় তাকে দেখে। মনে হলো—আহা, কোথায় ওর ব্যথা জেনে একটুও উপশম করতে পারতুম যদি সে বেদনার।...মনে হলো যেন কতকালের চেনা আপনার জন— ওকি, তুই হাসছিস্ কল্যাণি?"

"না-না, হাসবো কেন, বলো না তুমি।" ব'লে আবার মৃদু হেসে কল্যাণী বললে, "তারপর?"

সুব্রত বললে, "তারপর কাছেই একটা বেঞ্চে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বসেছিলেন, তিনি আমায় হাতছানি দিয়ে ডেকে বললেন, "আমার নাতনীর মুখের দিকে তাকিয়ে অমন ক'রে

কি দেখছো বাবা?' আমি বললুম, ও, উনি বুঝি আপনার নাতনি? তা অমন চমৎকার মেয়েটি ওই বর-ক'নের দিকে চেয়ে-চেয়ে অত কাঁদছে কেন? প্রবীণা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আর বাবা! সে অনেক কথা। কত ব্যথা সহ্য করার পর যে মানুষের চোখ দিয়ে জল পড়ে…'

অচেনা কোনো মেয়ের ব্যথার কথা জানতে চাওয়া উচিত নয় ভেবে বললুম, কিছু মনে করবেন না, আমি এমনিই জানতে চেয়েছিলুম। বৃদ্ধা বললেন, 'তাই-বা কে জানতে চায় বলো! জেনে তুমি অবশ্য তার কিছু প্রতিকার করতে পারবে না, কিন্তু কাউকে বলতে পারলে আমার বুকটা বোধহয় হাল্কা হবে।…বলবো তোমায়, শোনো।' ব'লে তিনি তাঁদের যে কাহিনী শোনালেন কল্যাণী, সংক্ষেপে আমি বলছি তোকে:

সেই ষ্টেশনের পশ্চিমদিকে মাঠের শেষে আকাশটা যেখানে হেলে পড়েছে, দিগন্তের সেই বনরেখার ফাঁকে যে একতলা বাড়ীটা দেখা যাচ্ছিলো সেইটে তাঁদের তিনপুরুষের বাস্তু-ভিটে। সেই মেয়েটি, তার বাপ-মা, একটি ছোট ভাই আর তিনি, এই ক'জন লোক নিয়ে তাঁদের সংসার। বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই কেটে যাচ্ছিলো দিনগুলো, কিন্তু সইলো না তাঁদের ভাগ্যে। মহামারী কলেরায় হঠাৎ তিনদিনের মধ্যে মেয়েটির মা-বাপ মারা গেলেন, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে, শেষে বুকে পাষাণ বেঁধে ঠাকুরমাই অতি কষ্টে নাতি-নাতনী দু'টিকে মানুষ করছিলেন, সেই সময় এলো আবার যুদ্ধের হিড়িক্।…

ক্রমে পাকিস্তানের বাস্তুহারার দল যখন দেশ-বিদেশের সব জায়গায় ছিট্‌কে পড়লো তখন তাঁদের পাশের গ্রাম মণিরামপুরে উদ্‌বাস্তুদের একটা ছোট দল এসে কুটির তৈরী ক'রে কোনো-রকমে বাস করতে লাগলো। তার মধ্যে ছিলেন তাঁদেরই স্বজাত এক ভদ্রলোক, তাঁর নাম লোকনাথ ভট্‌চায্যি···আজ যাঁর জন্যে তাঁদের এই দুর্ভোগ। যাক্‌, তারপর ব্যাপার ঘটলো এই যে, একদিন চৈত্রমাসের এক তপ্ত-গোধূলিতে বই-খাতা হাতে চারটি ছেলে স্কুল থেকে ফেরার পথে তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে তাঁদের বাড়ীর উঠোনে এসে খাবার জল চায়। ঠাকুরমা তখন গোয়ালের কাজে ব্যস্ত ছিলেন তাই তাঁর নাতনী 'সুমি'কে ডেকে ঘরে যা সামান্য মিষ্টি ছিল তাই আর জল দিতে বলেন তাদের। কাজেই, বাধ্য হয়ে সুমিত্রাকেই মিষ্টি-জল দিয়ে অতিথি-সৎকার করতে হয়েছিল, আর সেই হয়েছিল মেয়েটির পক্ষে কাল। ছেলে চারটির মধ্যে লোকনাথ ভটচায্যির কন্দর্পকান্তি নামে ছেলেটি যে সেদিন কি-চোখে চেয়েছিল তাঁর নাতনীর চোখের দিকে···

তারপর থেকে কন্দর্প ফাঁক পেলেই একলা চলে আসতো সুমিত্রাদের বাড়ীতে, আর সুমিত্রাও প্রথমে লজ্জা, পরে ক্রমে সঙ্কোচ কাটিয়ে দু-একটা কথার উত্তর দিতে-দিতে শেষপর্য্যন্ত চিঠিপত্র লেখালেখির ভেতর দিয়ে সেই ভাব তাদের গাঢ় হয়ে উঠেছিল। ঠাকুরমা অবশ্য সবই জানতেন। এমনকি, কন্দর্প যে তাঁদের গৃহদেবতার সামনে শপথ করেছে সুমিত্রাকে

বিয়ে করবার, সে-কথা জানতেও তাঁর বাকি ছিল না। বাপ-মা-মরা মেয়েটার একটা হিল্লে হবে ভেবে, তিনিও তাদের অবাধ মেলামেশায় বাধা দিতেন না। তখন কি আর তিনি জানতেন যে তাঁর আদরের নাতনীর বরাতে এত দুঃখ আছে?...

এইভাবে দিন কাটছে, এমন সময় একটা অঘটন ঘটে গেল। সুমিত্রার ভাইও কন্দর্পদের স্কুলে নীচের ক্লাসে পড়তো, সে একদিন খবর নিয়ে এসে ঠাকুরমাকে শোনালে যে, কন্দর্পদের এবার বরাত ফিরে গেল! কন্দর্পর বাবা লোকনাথ-বাবু 'আইরিস-সুইপের লটারী টিকিট' কিনে অনেক লাখ টাকা পেয়েছেন, বিলেত থেকে চিঠি এসেছে।...

শুনে নাতনী-ঠাকুরমার আনন্দ তখন দেখে কে? কিন্তু আনন্দের পরই অবসাদ আসা যে প্রকৃতির বাঁধা নিয়ম, আগে কে আর তা জানতে পারে বল্?...

কথাটা সত্যি। কিছুদিন পরেই জানা গেল, লোকনাথবাবু সত্যিই হঠাৎ অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হয়েছেন, যাকে বলে একেবারে আঙুল ফুলে কলাগাছ।...

লোকনাথবাবু গৃহিণীর মুখে শুনেছিলেন তাঁর ছেলের সঙ্গে সুমিত্রার ভাবের কথা এবং গোপনে তিনি তাঁর ভাবি-পুত্রবধূকে একদিন দেখে আসবার পর সেই অপূর্ব্বসুন্দরী মেয়েটিকে ঘরে আনবার লোভও হয়েছিল তাঁর, কিন্তু হঠাৎ বাদশা হওয়ার মতন অগাধ টাকার গদিতে ব'সে তাঁর

আভিজাত্যে বোধকরি বাধলো, তাই প্রথমে কড়া শাসন ক'রে ছেলেকে সুমিত্রাদের বাড়ী যেতে না দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর শেষে দরোয়ান দিয়ে কন্দর্পকে আটক করবার ব্যবস্থা করলেন, শুধু তাই নয়, তারপর নৈহাটির এক ধনীর মেয়ের সঙ্গে বিয়ের বন্দোবস্ত পাকা ক'রে, ছেলের সম্পূর্ণ অমত সত্ত্বেও সেখানে ছেলের বিয়ে দিয়ে দিলেন।···

ভাইয়ের মুখে সেই খবর পেয়ে কন্দর্পর বিয়ের দিন সুমিত্রার 'ফিট্' হয়েছিল, তারপর আর কখনো তার সঙ্গে দেখা হবার আশা নেই জেনে শেষ তাকে একবার দেখবার আশায় ছুটে এসেছিল সে ষ্টেশনে···বাধ্য হয়ে তাই ঠাকুরমাকেও আসতে হয়েছিল তার সঙ্গে।···"

সুমিত্রার দুঃখে কল্যাণীর দু'চোখে জল ভ'রে এলো। ছলছলচোখে সুব্রতর দিকে চেয়ে সে বললে, "সেই লোকনাথ ভটচায্যি লোকটার কখনো ভালো হবে না, দাদাভাই। তুমি দেখো, এর শাস্তি তাকে পেতেই হবে।"

যেন মূর্ত্তিমতী করুণা।···আমাদের দেশের মমতাময়ী মেয়েদের এইটুকুই বিশেষত্ব। এর মধ্যে আর চেনা-অচেনা জানা-অজানা নেই, কারুর দুঃখ-কষ্টের কথা শুনলে···কেউ কারুর ওপর অত্যাচার করেছে জানলে তারা সহ্য করতে পারে না···প্রতিকার করতে না পারলেও, বিন্দুপ্রমাণ অশ্রুজল আর দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে স্বৈরাচারীর শাস্তির জন্যে যে প্রার্থনা

জানায় অন্তর্যামীর কাছে, বৈদিকযুগ থেকে আজপর্য্যন্ত কোনো-দিনই তা ব্যর্থ হয়নি।

সুব্রত বললে, "আমারও সেই কথা মনে হয়েছিল কল্যাণী, তাই সেই বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছিলুম যে, লোকনাথ যা করেছেন তার ফল তিনি ভোগ করবেন, কিন্তু আমি আপনার নাতনীর জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা ক'রে দেখবো যদি তার কিছু উপকারে লাগতে পারি। হাজারীবাগে আমার এক বন্ধু আছে শ্যামল চক্রবর্ত্তী, ছেলেটি যেমন শিক্ষিত, তেমনি স্বাস্থ্যবান্ আর তার বাবাও অতি সজ্জন এবং অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। তিনি তাঁর ছেলের জন্যে একটি যা মেয়ে খুঁজছেন, ঠিক তাঁর পছন্দমত রূপ-গুণ সবই আছে আপনার নাতনীর, তাই সুমিত্রাকে দেখলে নিশ্চয়ই তাঁর পছন্দ হবে···গরীব ব'লে কোনো অমত করবেন না তিনি। আপনার বাড়ীর ঠিকানা তো জেনেই গেলুম, মাঝে-মাঝে কলকাতায় যাবার সময় এই ষ্টেশনে আমায় আসতে হয়, কিছু সুবিধে করতে পারলেই আমি আপনার ঐ বাড়ীতে গিয়ে খবর দিয়ে আসবো। এখানে আর অপেক্ষা না ক'রে, ওকে নিয়ে এখন আপনি বাড়ী চ'লে যান।···

···এত কথা বলতে হলো কেন তোকে এবার বুঝতে পারছিস্ তো কল্যাণি? তোর কথা হিসেবে—বিয়ে ক'রে যদি হঠাৎ বড়লোক হয়ে যাই আর তোদের চিনতে না পারি তখন?···কাজ কি ওসব বিয়ের ঝঞ্ঝাটে।"

বলেই সুব্রত হঠাৎ চুপ ক'রে কি যেন ভাবতে লাগলো।

কল্যাণীও চুপ।

সুব্রত ভাবছিল, কি বোকা সে! যত ভালো পাত্রই হোক্ তার বন্ধু শ্যামল, তাকে বিয়ে করলেই কি সুমিত্রা জীবনে সুখী হবে? মনে পড়লো কন্দর্প-সুমিত্রার ভালোবাসার ইতিহাস··· মনে পড়লো প্রত্যাখ্যাতা মেয়েটির সেই হরিণীর মত আয়ত দুটি সজল-চোখের সকরুণ দৃষ্টির অব্যক্ত-আকুতির আবেদন। সেই-রকম দুটি জলভরা চোখ তার এই তরুণ বয়সে যে কতবার কত রূপে তার চোখের সামনে দেখা দিয়েছে···একে-একে অতীতের সেইসব দৃশ্যই মনের মণিকোঠায় হীরকদ্যুতির মতন ঝক্‌মক্ ক'রে উঠলো।···তার জ্যোতিতে ক্ষণিকের জন্যে মোহাবিষ্ট হয়ে যেন জাতিস্মরের চোখে সে দেখলে, শুধু এজন্মের নয়···শুধু সেই মেয়েটির চোখ নয়···দেখলে, জন্মজন্মান্তরের পরিচিত কত মেয়ের অশ্রুসিক্ত কাতর চোখের নীরব অভিব্যক্তি···

জীবনের যাত্রাপথে লক্ষ্যস্থলে পৌছোতে গেলে, সেই চোখের জল পাথেয় করেই যেন তাকে অবিরাম চলতে হবে।

মনের কি বিচিত্র খেলা···

অনেকক্ষণ এইভাবে কাটলো। উদাসীনের মতন দাদাকে এইরকম চুপ ক'রে ব'সে থাকতে দেখে কল্যাণী বললে, "ব'সে-ব'সে কি এত ভাবছো দাদাভাই?"

সংবিৎ ফিরে এলো সুব্রতর। বললে, "ও, খুব ভাবছি—না?" ব'লে আর-একটু কি ভেবে নিয়ে বললে,""হ্যাঁ, আমি ভাবছি, বাংলাদেশে এত রূপবান্ গুণবান্ পাত্র থাকতে,

ম্যানেজারমশাই আমার মতন অভাজনের দিকে দৃষ্টি দিলেন কেন। যাক্, বাবা কি বললেন শুনি। নিশ্চয়ই হাত বাড়িয়ে আকাশের চাঁদ পেলেন ?”

কল্যাণী বললে, “তুমিই বলো না, এ-অবস্থায় তাঁর কি বলা উচিত। দেনার দায়ে যারা লোকলয়ে মুখ দেখাতে পারে না, সেই অবস্থায় তাদের উপযুক্ত ছেলের দ্বারা যদি বিনা-চেষ্টায় ঘরে ব'সে মুখরক্ষার কোনো ব্যবস্থা হয়ে যায় আপনা-আপনি তো কোন্ ছেলের বাপ তাতে রাজী না হয় ? শুধু দেনা শোধ নয়, মালক্ষ্মী তার ঘরে অচলা হয়ে থাকবেন জেনেও কেউ অরাজী হতে পারে কখনো ?”

গম্ভীর হয়ে ওঠে সুব্রতর মুখ। ভারিগলায় সে ব'লে ওঠে, “কিন্তু, বাবা রাজী হ'লে আর তুই মত দিলেও যদি আমার মত না থাকে ? আমি যদি বিয়ে না করি ? আমি কিছুতেই ওখানে বিয়ে করবো না—করতে পারি না, কাজেই তোদের আশা দুরাশাই হবে, জেনে রাখ্।”

ব'লে তাড়াতাড়ি সে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে ঘর থেকে বেরুতে যাবে এমন সময় পাশের ঘর থেকে বাবার আহ্বান এলো—“খাওয়া সেরে একবার এ-ঘরে এসো সু, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।”

কথাটা যে কি তা সে জানে।···কল্যাণীর মুখে আগে শুনেছে তাই তৈরী হয়েই বাবার ঘরে ঢুকলো।

শয্যায় শুয়ে ধূমপান করছিলেন মনোহর, ছেলেকে দেখে

সোজা হয়ে উঠে বসলেন। ...“তারপর? যেজন্যে সদরে গিয়েছিলে তার কিছু ব্যবস্থা হয়েছে কি?”

উৎকণ্ঠিত পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে, পকেট থেকে পাঁচখানা দশ টাকার নোট বের ক'রে সুব্রত বললে, “আজ্ঞে হ্যাঁ বাবা, সামান্য একটা ব্যবস্থা ক'রে এসেছি, আজ তারা ‘এডভান্স’ পঞ্চাশ টাকা দিয়েছে, এরপর আপনি একটু সুস্থ হ'লে আপনাকে সদরে নিয়ে গিয়ে রেজেষ্ট্রীটা করিয়ে দিলেই বাকি টাকাটা দিয়ে দেবে। পাঁচ বিঘে জমি-সমেত বড়পুকুরটা লিখে দিলে মোট আটশো টাকা দেবে, এর বেশী তারা দিতে পারবে না।”

“মোটে আটশো?” ব'লে গড়গড়ার নলটা মুখে নিয়ে মনোহর আবার তামাক টানেন, তারপর চিন্তামলিনমুখে বলেন, “মাত্র আটশো টাকায় কি হবে বাবা? আজকের পঞ্চাশ টাকার মধ্যে কিছু টাকার চাল...মুদির দোকানের জিনিসপত্তর কিছু তো আগেই কিনতে হবে, নইলে হাঁড়ি চড়বে না। দরকার প্রায় দশ হাজার টাকার, তার মধ্যে ‘সমুদ্রে পাদ্যঅর্ঘ্য’র মতন এই সামান্য আটশো টাকায় কি হবে বল্ তো?”

চুপ ক'রে থাকে সুব্রত।

তামাক টানতে-টানতে মনোহর আবার বলেন, “এর একমাত্র উপায় যা আছে সেই কথা বলবার জন্যেই তোমায় ডেকেছি এখন। আমি ভাবছি তোমার বিয়ের কথা। বর্ত্তমান মহাজন আমার বাল্যবন্ধু ধনকুবের যতীন বোস—যাঁর উদারতায়

এখনো আমরা পৈতৃকভিটেয় ব'সে আছি, তাঁর একমাত্র মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের প্রস্তাব জানিয়ে তিনি আজ সকালে ম্যানেজার রতন দাসকে পাঠিয়েছিলেন। উপযুক্ত ছেলে তুমি, তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে পাকা কথা বলবো ব'লে জানিয়েছি আমি ম্যানেজারকে। ভেবে ত্যাখো, সত্যি যদি এ বিয়ে হয় তাহ'লে আমাদের ভাগ্যপরিবর্ত্তনের—"

অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে সুব্রত। মাথা দুলিয়ে বলে, "কল্যাণী আমায় বলেছে সব, কিন্তু এ-বিয়ে তো হতে পারে না বাবা!"

মনোহর একেবারে নির্ব্বাক হয়ে যান। সুব্রত যে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বিবাহসম্বন্ধে তার মতামত স্পষ্ট মুখের উপর বলছে এ যেন তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না। কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে ব'সে থাকার পর তিনি গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করেন, "কিন্তু, কেন এ বিয়ে হতে পারে না যদি জিগেস করি?"

মাথা নীচু ক'রে সুব্রত উত্তর দিলে, "জিগেস যখন করছেন তখন বাধ্য হয়েই বলতে হচ্ছে—যতীনবাবুর সেই মেয়েটির মাথা খারাপ। সকলেই জানে সে পাগল, আর সেইজন্যেই এই উনিশ-কুড়ি বছর বয়সেও তার বিয়ে হয়নি।"

"পাগল!···মাথা খারাপ!"

মনোহর ইতস্তত করেন, এরপর আর কোনো কথাই বলতে পারেন না তিনি।

নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে সুব্রত। তারপর নিজের নিস্তব্ধ ঘরে গিয়ে সে শুয়ে পড়ে।

নিজেও সে কম বিস্মিত হয়নি। তাহ'লে—তাহ'লে এই উদ্দেশ্য নিয়েই কি যতীনবাবু এতদিন তার এবং তার বাবার প্রতি এত উদারতা দেখিয়ে এসেছেন? তাই যদি হয়, তাহলেও এক হিসেবে কৃতজ্ঞ মন নিয়ে তাঁর সব ইচ্ছা পূর্ণ করা উচিত তাদের পিতা-পুত্রের। দুর্দ্দিনে যিনি দরিদ্র খাতক-বন্ধুকে দু'হাত ভ'রে সাহায্য করতে এতটুকু কার্পণ্য করেননি, যাঁর অকাতর অনুগ্রহ না পেলে সে আজ অন্তত শিক্ষিতের গর্ব্ব করতে পারতো না, সেই তিনি, তাঁর একটা সদিচ্ছা—তাঁর যথাসর্ব্বস্ব আমাদের হাতে তুলে দিয়ে তিনি তৃপ্তি পাবেন এই ইচ্ছা—এত-বড় বদান্যতা অত-বড় ধনীর পক্ষে সম্ভব হয়েছে এ-যুগে এরকম গল্পও তো শোনেনি সুব্রত কারুর মুখে!

তাঁর মেয়ে গঙ্গোত্রী।

মনে পড়ে, হোষ্টেলে থাকার সময় মাঝে-মাঝে তার নিমন্ত্রণ হতো তাঁর বাড়ীতে, সেই সময় সে দেখেছে গঙ্গোত্রীকে।

সুন্দরী বালিকা গঙ্গোত্রী। তাকে যখন দেখেছে সুব্রত তখন তার বয়স ন-দশ বছর হবে।

সেই এক দিন।

সেদিনের কথা মনে হতেই সুব্রত যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।··· যতীন্দ্রনাথ গেছেন রাণীগঞ্জের কোলিয়ারীতে বিশেষ কি কাজের জন্যে, সেদিন রবিবার। প্রায় রবিবারে তাঁর বাড়ীতে সুব্রতর নিমন্ত্রণ থাকতো, সেদিনেও আছে···সেদিন তার শরীরটা

ভালো না থাকার জন্যে যেতে ইচ্ছে না থাকলেও তাকে যেতে হয়েছিল বাড়ীর কর্ত্রীঠাকুরাণীর আদরের আহ্বানে।

চন্দ্রিমাদেবীর আমন্ত্রণ সে এড়াবে কি ক'রে ?

যতীন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণী চন্দ্রিমাদেবী বাংলার স্নেহকোমলা মা। প্রতি রবিবারে তিনি অনেক ছেলেকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে খাওয়াতেন···সবাই তারা তাঁর সন্তান···সকলেই তাঁর সঙ্গে মা-মাসীমা সুবাদ পাতিয়েছিল।

সুব্রত তাঁকে 'মা' ব'লে ডেকেই তার শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করতো—ছোটবেলায় মাকে হারিয়ে সে যেন চন্দ্রিমাদেবীর মধ্যেই তার হারানো-মাকে খুঁজে পেয়েছিল। তবে, এতদিন যাওয়া-আসা করছে সে-বাড়ীতে, শুধু সেদিন ছাড়া আর কোনোদিন সে দেখতে পায়নি গঙ্গোত্রীকে।···

খাওয়া-দাওয়ার পর নিমন্ত্রিত সব ছেলেরাই চলে গেছে, যায়নি তখনো সুব্রত। চন্দ্রিমাদেবীর সঙ্গে ব'সে সুখ-দুঃখের গল্প করছিল এমন সময় বিদ্যুল্লতার মতন সুন্দরী একটি মেয়ে ছুটতে-ছুটতে এসে পিছন দিক থেকে সুব্রতর পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরেই খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠলো!

ব্যাপারটা এত আকস্মিক আর অস্বাভাবিক আর এমন অবাঞ্ছিত যে, সে-অবস্থায় কি করবে ভেবে না পেয়ে সুব্রত সন্ত্রস্ত হয়ে দু'হাত দিয়ে মেয়েটির বাহুর বন্ধন ছাড়াতে চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না।

উঠে দাঁড়ালেন চন্দ্রিমাদেবী···মেয়েটির হাত চেপে ধ'রে তিরস্কারের স্বরে রূঢ়কণ্ঠে বললেন, "একি হচ্ছে, গঙ্গা ! ছাড়ো—ছেড়ে দাও সুব্রতকে ?···"

"হি-হি-হি-হি ! না না, ছাড়বো না···ককখনো ছাড়বো না···এমনি ক'রে আঁকড়ে ধ'রে থাকবো একে—"

বলতে-বলতে মেয়েটি আরো জোরে গলা চেপে ধরে সুব্রতর ।

বিস্ময়ে সুব্রত বিমূঢ়···অসাড়···নির্ব্বাক···নিস্পন্দ !

"মিস্ ব্রাউন ? কাম্ !···কাম্ !···"

চন্দ্রিমাদেবীর আহ্বানের সঙ্গে দ্রুতপদে ছুটে আসেন ইওরোপীয়ান্ নার্স মিস্ ব্রাউন ! তাঁকে দেখেই গলা ছেড়ে দিয়ে গঙ্গোত্রী ঘরের এক কোণে গিয়ে দাঁড়ায় ··বলির পশুর মত কাঁপতে-কাঁপতে কাতর চোখে তাকিয়ে থাকে নার্সের হাতের আন্দোলিত লিক্‌লিকে বেতের দিকে। তারপরেই ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধ'রে আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার ক'রে ওঠে—"ওমা, না না, আর আমি পালিয়ে আসবো না, তুমি ওকে বারণ করো মা···"

একদিকে শিকারীর বাণবিদ্ধ হবার আগে হরিণীর জলে-টল্‌মল্ ভয়ার্ত্ত-চোখের সকরুণ দৃষ্টি—অন্যদিকে বাষ্পাকুল-চোখে মায়ের বেদনামলিন মায়ার খেলা !···চোখের জলের এইসব রূপ দেখা যেন সুব্রতর ভবিতব্যতা। কে জানে, ভবিষ্যতে চোখের জলের আরো কত রূপ দেখে তাকে অশ্রুজল সম্বরণ করতে হবে !···

হাত তোলেন চন্দ্রিমাদেবী—"না না, মেরো না মিস্, ওকে ভুলিয়ে নিয়ে যাও।"

দু'হাতে চোখ মুছতে-মুছতে গঙ্গোত্রী নার্সের সঙ্গে অন্য ঘরে চলে যায়।

বালিকা গঙ্গোত্রী। যতীন্দ্রনাথের একমাত্র সন্তান। এই মেয়েটির জন্যে বাপের দারুণ দুশ্চিন্তা···মেয়ে বিকৃতমস্তিষ্কা ব'লে মায়ের মনেও তিলার্দ্ধ সুখ নেই—শান্তি নেই। কিন্তু জন্ম হতে সে এমন নয়। সাত বছর বয়সে দুরন্ত টাইফয়েড রোগে তার বাঁচবার আশা ছিল না যখন, তখন বহু অর্থব্যয় আর অনেক চিকিৎসা-সেবাশুশ্রূষার ফলে সে প্রাণটা ফিরে পেলেও, হারিয়ে ফেলেছে তার স্মৃতিশক্তি।

তবু আশ্চর্য্য, সে তার মা-বাপকে চেনে···মাঝে-মাঝে উন্মাদ হয়ে গেলেও মাঝে-মাঝে স্বাভাবিক জ্ঞানও ফিরে আসে তার। আজও তার চিকিৎসা চলছে···ইওরোপীয়ান নার্সের তত্ত্বাবধানে সে থাকে···তার চিকিৎসার ভার নিয়েছেন বিখ্যাত উন্মাদ-চিকিৎসক মিঃ রুদ্র।

মাঝে-মাঝে নার্সের সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে মার কাছে পালিয়ে আসে গঙ্গোত্রী, উন্মাদিনী মেয়েকে সহ্য করতে না পারার ফলে তাঁর হয়েছে হিষ্টিরিয়া ব্যায়রাম!

কবে যে গঙ্গোত্রী সুস্থ হয়ে উঠবে, বা এইরকমই থেকে যাবে তার আশ্বাস কেউ দিতে না পারলেও, ডাক্তার রুদ্র বলেন, একদিন সেরে যাবে ওর এই রোগ। কিন্তু মেয়ের হাসি-

কান্না চীৎকার—এমনকি, নার্সের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে জনমুখর পথের উপর ছুটে বেরিয়ে পড়ার বিরাম নেই দেখে মা আর কোনো আশাই করতে পারেন না মেয়ের উপর।…

…সেই মেয়ে। সেই অর্দ্ধোন্মাদিনী গঙ্গোত্রীকে বিয়ে করতে হবে তাকে। অসম্ভব। তাকে দয়া করতে পারা যায়, তার জন্যে দুঃখ করা চলে, কিন্তু জীবনের সহচারিণী করা চলে না তাকে। তার চেয়ে আজীবনব্যাপী এই দারিদ্র্যই যদি বরণ ক'রে নিতে হয় সুব্রতকে…এই যদি তার বিধিলিপি হয়ে থাকে তবে তাই হোক্, কি আর করা যাবে।…

মাথার উপর অলক্ষ্য-দেবতা তাঁর এই 'লিপি-নিন্দা' শুনে হাসলেন কিনা কে জানে।

তামাক খেতে-খেতে গড়গড়ার নলটা হাতে রেখে মনোহর আচ্ছন্নের মত ভাবছিলেন এখন কি করা যায়। …রতন দাস কাল স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসে বিয়ের কথা উত্থাপন করেছেন… প্রলোভন দেখিয়েছেন…তাঁর মুখ থেকে ঠিক কোনো প্রতিশ্রুতি না নিয়েও স্বয়ংসিদ্ধের মত নিজে-নিজেই কথা পাকা ক'রে মনিবকে সেই সুখবর দেবার জন্যে প্রায় ছুটতে-ছুটতেই

বেরিয়ে গেছেন বাড়ী থেকে। তাঁর কথার ফাঁকে এমন একটু অবসর পান্‌নি যে বলেন, ছেলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে পরে জানাবেন তিনি তাঁর মত কি।…যদিও তিনি তারপর এ-কথাটা চেপে গেছলেন ছেলের কাছে।

…এদিকে ছেলের মনের ভাব তিনি যা বুঝেছেন তাতে সহজে যে সে রাজী হবে না তাও তিনি জানেন। আবার ওদিকে ম্যানেজারের মুখে খবর পেয়ে সব কাজ স্থগিত রেখে যতীন্দ্রনাথ যদি নিজে চলে আসেন, তখন কি জবাব দেবেন তাঁকে এইসব ভাবছিলেন, এমন সময় দেখলেন, বাইরে বেরুবার জন্যে তৈরী হয়ে সুব্রত চুপিসারে তাঁর পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।

…কাল সন্ধ্যার সময় দেখা হবার পর থেকে সুব্রত আর দেখা করেনি তাঁর সঙ্গে, অথচ বাড়ীতেই আছে কাল থেকে একথা তিনি কল্যাণীর মুখে শুনেছেন। শুনেও এ-প্রসঙ্গ নিয়ে অতঃপর ছেলের সঙ্গে আর তর্ক করবেন না ভেবে তিনিও ডাকেননি তাকে, কিন্তু বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে ব'লে এখন বাধ্য হয়েই ডাকতে হলো, বললেন, "একবার এদিকে এসো তো সু, একটা বিশেষ কথা আছে তোমার সঙ্গে।"

সুব্রত সামনে আসতেই তিনি বললেন, "কাল তোমায় যে-কথাটা বলেছিলুম, নিশ্চয়ই সে-সম্বন্ধে তুমি ভেবেছো—কি ঠিক করলে?"

মাথা নীচু ক'রে সুব্রত বেশ সংযতভাবেই আস্তে-আস্তে

বললে, "ভাববার আর কি আছে বাবা। ও-সম্বন্ধে আমার মতামত তো আমি কালই আপনাকে জানিয়ে গেছি।"

মনোহর বললেন, "হ্যাঁ, তা আমি শুনেছি আর মনেও আছে আমার। কিন্তু তুমি সে-কথার সেইখানে পূর্ণচ্ছেদ টানলেও, আমায় যে আবার তার পর থেকে সুরু করতে হচ্ছে। আমার এই রুগ্ন অপটু দেহ···খেয়াপারের যাত্রী তোমার ওই বৃদ্ধা বধির পিসীমা···ওঁকে নিয়ে আমি এরপর কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো বলো তো? খেতে পাই না-পাই তবু এখনো এই পিতৃপুরুষের ভিটেয় মাথা গুঁজে প'ড়ে আছি। তোমার কি, এরপর যেখান হোক্ চলে যাবে, কল্যাণীও যাবে তার শ্বশুরবাড়ীতে। তার পর? অবশ্য তোমার মুখে শুনেছি যে, মেয়েটি সুন্দরী হলেও তার মাথা খারাপ। আমারই কি ইচ্ছে, বিরাট সম্পত্তির লোভে সেই অর্দ্ধোন্মাদ-মেয়েকে গৃহলক্ষ্মী ক'রে ঘরে নিয়ে আসা? কিন্তু এটাও তো আমাদের ভাবতে হবে যে, যতীনবাবু আমাদের জন্মে—বিশেষ ক'রে তোমাকে মানুষ ক'রে গ'ড়ে তোলবার জন্মে কি অসাধ্য-সাধন করেছেন! অমানুষের মত তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া অন্তত তোমার মতন শিক্ষিত ছেলের উচিত হবে কিনা তোমায় আমি আর-একবার ভালো ক'রে ভেবে দেখতে বলছি।"

সুব্রত খানিক চুপ ক'রে কি ভাবলে, তারপর বললে, "বেশ, আমার মতামত আমি কল্যাণীকে জানাবো, তার মুখেই সব শুনতে পাবেন আপনি।"

বিরক্তির ভাবটা প্রকাশ না ক'রে, ভ্রূকুঁচকে মনোহর বললেন, "তার চেয়ে তোমার মতামতটা তুমিই নাহয় যতীন-বাবুকে জানিয়ে দিও, আমাকে আর নিমিত্তের ভাগী কোরো না।"

সুব্রত নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে তার নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে রইলো। কল্যাণীর অনেক কাকুতি-মিনতিতেও সে-রাত্রে সে আর জলস্পর্শ করলে না।

ভোরে উঠে রান্নাঘর পরিষ্কার করবার সময় হঠাৎ সুব্রতকে দরজার সামনে দেখে কল্যাণী ব'লে উঠলো, "একি দাদাভাই, এত সকালে সাজগোজ ক'রে কোথায় চলেছো তুমি?"

ম্লান হেসে সুব্রত বললে, "কলকাতায় যাচ্ছি কল্যাণী, কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে আমার মতটা জানিয়ে আসতে হবে।"

বিবর্ণমুখে কল্যাণী জিগেস করলে, "মত? না অমত?"

ঠোঁটের কোণে ক্লান্ত-হাসির রেখা টেনে সুব্রত বললে, "তোরা শুধু নিজেদের স্বার্থটাই দেখলি ভাই, আমার দুঃখ বুঝলি না। না বুঝলেও আমার মনে হয়, কাকাবাবুকে বুঝিয়ে বললে তিনি বুঝবেন...তাঁর মেয়েকে বিয়ে না করার অপরাধে অন্তত ভিটে-ছাড়া করবেন না আমাদের।"

কল্যাণীর চোখ ছলছলিয়ে এলো।

একটু এগিয়ে গিয়ে ছোট বোন্‌টির মাথায় হাত রেখে সুব্রত বললে, "কাঁদিস্‌নি ভাই, আমি তো একেবারে চলে

যাচ্ছি না, আবার আসবো। এবারে নবগোপালের সঙ্গে দেখা হলো না, আবার যখন আসবো, তোর বাড়ীতে গিয়ে দেখা ক'রে আসবো।"

দাদাকে প্রণাম ক'রে কল্যাণীর দু-চোখ কান্নায় উদ্বেল হয়ে উঠলো।

আবার সেই অশ্রুর মায়া···সজল চোখের কাতর দৃষ্টি।···

সুব্রত ভাবলে, আদ্যাশক্তির এও এক অপরূপ রূপ!

পিতার রুদ্ধ-দরজায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে সুব্রত। তারপর পিছন ফিরতেই ছাখে—শয্যা ছেড়ে কখন্ উঠে এসে প্রায় দৃষ্টিহীন-চোখে তার দিকে তাকিয়ে রুগ্না পিসীমা পথ আগলে জিগেস করছেন, "এত সকালে কোথায় যাচ্ছিস রে, সু? যেখানেই যাস্, খেয়ে-দেয়ে তারপর যাস্ বাপু।"

হাসে সুব্রত···বলে, "এখুনি আসছি পিসীমা, এসে খাওয়া-দাওয়া করবো, এখন পথ ছাড়ো।"

পিসীমা বলেন, "এখুনি যদি আসবি, তবে কলি কাঁদছে কেন? তোরা মনে করিস্, পিসীমার ঠাহর নেই, মিথ্যে বললেই পার পাবি। কিন্তু তা নয় রে! পিসীমা চোখেও দেখতে পায়, আর চুপিচুপি কথা কইলেও সব কথাই তার কানে ঢোকে। তুচ্ছু একটা বিয়ের জন্যে তুই রাগ ক'রে না খেয়ে বাড়ী থেকে চলে যাবি—কাজ নেই বাপু আর তোর সেই পাগলী-মেয়েকে বিয়ে ক'রে, তার চেয়ে জমিদার বাড়ী নেয় নিক্, তোকে নিয়ে আমরা গাছতলায় ঘর বেঁধে থাকবো।"

বিব্রত হয়ে ওঠে সুব্রত—"কি সব বাজে বকছো পিসীমা ?" ব'লে আস্তে-আস্তে তাঁকে প্রায় একরকম সরিয়ে দিয়েই সে বেরিয়ে পড়ে হনহন্ ক'রে।

*

* *

ভারাক্রান্ত মনে পথ চলতে-চলতে কুণ্ডুদের প্রকাণ্ড তাল-পুকুরের বাঁকের মুখে হঠাৎ যতীন্দ্রনাথকে দেখেই সুব্রত থম্‌কে থেমে গেল।

এমন সময় এখানে সপার্ষদ জমিদারকে দেখবার কল্পনাও করেনি ও। তাড়াতাড়ি মাথা নীচু ক'রে প্রথমে প্রতিপালক যতীন্দ্রনাথকে আর তাঁর পিছনে পণ্ডিত চক্রবর্ত্তীমশাইকে প্রণাম ক'রে, তারপর রতন দাস ও পাড়ার কয়েকজন প্রতিবেশীকে অভিবাদন জানিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াতেই, স্মিতহাসি হেসে যতীন্দ্র-নাথ বললেন, "এত সকালে কোথায় চলেছো সুব্রত ?"

সুব্রত বললে, "আজ্ঞে, কলকাতায়। ন'টার ট্রেনটা ধরতে হবে কিনা, তাই—"

যতীন্দ্রনাথ বললেন, "বেশ তো। কিন্তু তার জন্যে এতটা পথ হেঁটে গিয়ে ট্রেন ধরবার দরকার নেই তোমার। আমি কাল রাত্রে এসেছি, আজই বিকেলে আবার ফিরবো, আমার সঙ্গে মোটরেই যেও। এখন একবার তোমাদের বাড়ীতে যাচ্ছি, চলো আমায় পৌঁছে দেবে।"

স্বেদসিক্ত হয়ে উঠলো সুব্রত। বাড়ীতে পৌঁছে দেবার এ-আহ্বান ও উপেক্ষা করবে কেমন ক'রে? একবার কেসে, একটু আম্‌তা-আম্‌তা ক'রে বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললে, "হ্যাঁ, তা দেখুন, আমার একটু—বিশেষ দরকার আছে যাওয়ার কাকাবাবু, একটা অফিসে আজ 'ইণ্টারভিউ' দিতে হবে, সময়ে পৌঁছোতে না পারলে হয়তো কাজটা পাবো না। আপনি দয়া ক'রে হুকুম দিলেই এখন আমি—ও, আমাদের বাড়ী যাবেন তো? তা বাবা এতক্ষণ উঠেছেন, পিসীমা আছেন, কল্যাণী আছে, আপনার কোনো অসুবিধে হবে না।"

একটু হেসে যতীন্দ্রনাথ স্নেহের স্বরে বললেন, "বেশ, যাও। বাধা দেবো না তোমায়। কিন্তু তোমার কাজ সেরে সন্ধ্যের দিকে বা কাল সকালে শ্যামবাজারের বাড়ীতে অতি অবশ্য একবার দেখা কোরো আমার সঙ্গে, কথা আছে।"

প্রায় ঝড়ের বেগে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে বাঁচে সুব্রত।

চলতে-চলতে যতীন্দ্রনাথ বলেন, "ছেলেটি ভালো। কি বলো, রতন?"

উপদেষ্টার মত বিজ্ঞ রতন দাস মাথা কাত করেন, বলেন, "আজ্ঞে, সে-কথা আর দু'বার বলতে হবে না বাবু। ছেলে খুবই সরেস, তবে—মানে, বড় একগুঁয়ে। এই ধরুন, আপনি বললেন···ভালো কথাই বললেন যে, এতটা পথ কেন হাঁটবে, আমার সঙ্গে মোটরে যেও। শুনলে সে-কথা? বলে, চাকরি যাবে। আরে বাপু, যাক্ না চাকরি। যাঁর কথা তুমি

হেলা করলে, তাঁর দয়া পেলে এরপর তুমিই তো কত-শত চাকর রাখবে···হেঁ-হেঁ, আজকালকার ছেলে কিনা···”

জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী নস্য নিতে-নিতে বললেন, “সে-কথা হাজার বার। আজকালকার বওয়াটে ছেলেগুলো বড়-ছোট মানতে চায় না এই তো তাদের দোষ।”

যতীন্দ্রনাথ বললেন, “তাদের সঙ্গে তুলনা করবেন না ওর। সুব্রত পুতুল নয়—মানুষ। কারুর অসার মতে মত না দিয়ে, কর্ত্তব্য পালন করতে, নিজের লক্ষ্যস্থানে পৌছোবার জন্যে ও সদম্ভে পথ চলবে। এমনি ছেলেই তো চাই আমি। জানো রতন, ও যে কত ভালো তা আমি এই ক'বছর ওকে যাচাই ক'রে জেনে নিয়েছি, কিন্তু ওকে জামাই করবার কথা কোনো দিনই মনে হয়নি আমার। গঙ্গোত্রীর বিয়ের কথা আমি কল্পনাও করিনি কখনো···শুধু ভেবেছি সে সেরে উঠবে কি ক'রে।”

মনিবের প্রত্যেক কথার মাত্রায় ঘাড় নেড়ে-নেড়ে সায় দেবার পর তিনি থামতেই রতন দাস বললেন, “আজ্ঞে, হ্যাঁ বাবু। দম্ভ ওনার খুব। এই দম্ভ বজায় রেখে চলতে পারলে আর ওনাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে হবে না কখনো। ঠিকই তো বলেছেন আপনি। আর গঙ্গাদিদিমণির বিয়ের কথা তো আপনার মনেই ছিল না। মানে, গিন্নিমাঠাকৃরুণই তো পছন্দ করেছেন ওনাকে জামাই করবেন ব'লে। যাই বলুন বাবু, মাঠাকৃরুণ ভুল করেননি। মানে, ছেলে উনি সত্যিই খুব ভালো।”

একনিশ্বাসে রতন দাস এত কথা ব'লে গেলেও, যাঁকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, তিনি এর একবর্ণও শুনলেন না। তিনি তখন ভাবছিলেন তাঁর আদরের দুলালী একমাত্র সন্তান গঙ্গোত্রীর কথা :

...উন্মাদ মেয়েটির জন্যে তিনি দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের আনিয়ে তাঁদের ব্যবস্থামত অনুষ্ঠানের ত্রুটী করেননি কিছু। রোগের সুরু টাইফয়েড থেকেই ডাক্তারে-নার্সে-ওষুধে-লোকজনের হুল্লোড়ে বাড়ী একেবারে দ্বিতীয় হাঁসপাতাল হয়ে উঠেছিল।...সে রোগটা সারলো, কিন্তু মেয়ে হারিয়ে ফেললে তার স্মৃতিশক্তি। প্রথমে তো সে কথাই বলতে পারতো না—কানেও শুনতে পেতো না কিছু। তারপর উন্মাদ-রোগের স্পেশালিষ্ট ডাঃ রুদ্রের প্রাণপাত চিকিৎসার ফলে—মাঝে-মাঝে স্মৃতির বিলোপ হলেও মাঝে-মাঝে আবার অল্প সময়ের জন্যে এখন স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে আসে তার।

...ডাক্তার রুদ্র জানিয়েছেন, বর্ত্তমানে গঙ্গোত্রীর অবস্থা অনেকটা আয়ত্তাধীনে এসেছে, তাঁর মনে হয় এবং বিদেশী ডাক্তাররা বলেন, এবার বিবাহ দিলেই সে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হবে।

...বিবাহ। গঙ্গোত্রীর বিবাহ।

...চিন্তিত হয়ে উঠেছেন যতীন্দ্রনাথ। অন্তঃপুরে গৃহিণীও এই খবর পেয়ে মেয়ের বিবাহের জন্যে তাগিদে-তাগিদে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছেন স্বামীকে, "আর দেরী না ক'রে যত শীগগির পারো গঙ্গার বিয়ে দিয়ে দাও—মেয়ে আমার সেরে উঠুক।"

···টাইফয়েডের আগে কত আশাই না ছিল এই ধনী-দম্পতির। একমাত্র মেয়ে তাঁদের, কিভাবে শিক্ষা দিয়ে তাকে গ'ড়ে তুলবেন, একটু বড় হলেই পিতা তাকে নিজে নিয়ে যাবেন পাশ্চাত্যের নানা দেশে···শিক্ষা শেষ হবার পর তাঁদের অবর্ত্তমানে পিতার এ বিপুল কর্ম্মভার যাতে সে অনায়াসে বহন করতে পারে। সহসা কাল রোগ এসে তাঁদের সব আশা নির্ম্মূল ক'রে দিলে।

এক-এক সময় কর্ম্মক্লান্ত যতীন্দ্রনাথ ভাবতেন, কি হবে তাঁর আর এই বিপুল বিত্ত সঞ্চয় ক'রে—ভোগ করবে কে? জীবনাবসানের সঙ্গে তো তাঁর সব কীর্ত্তিই ধ্বংস হয়ে যাবে।··· আর ভাবতে না পেরে চিন্তাক্লিষ্ট ক্লান্ত দেহ যখন এলিয়ে পড়তো সেই সময় মহাভারতবর্ণিত অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের 'সঞ্জয়'এর মত 'এক্সরে'র অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিয়ে প্রভুর মনের গভীরে তলিয়ে গিয়ে উপায় আবিষ্কার ক'রে, রতন দাসই অন্নদাতাকে আশ্বাসবাণী শোনাতেন, "ভেঙে পড়বার এতে কি আছে বাবু? মানে, হোক্ না উন্মাদিনী মেয়ে···সদ্বংশজাত শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান্ পাত্রেরও অভাব নেই জগতে। খবর পেলে কত পাত্রের বাপ আপনার দরজায় ধন্না দিয়ে প'ড়ে থাকবে—মানে, তাদের ছেলেদের মধ্যে থেকে আপনার পছন্দমত ছেলে বেছে নিয়ে আপনার উদার মনের উৎসাহ দিয়ে তাকে গ'ড়ে তুলন, আপনার কীর্ত্তি অক্ষয় হয়ে থাকবে।"

কথাটা কানাকানি হলেও যখন জানাজানি হয়ে গেল

তখন সম্পত্তির লোভে বস্তাপচা-পাত্রের অনেক অর্থগৃধ্নু পিতাই তাঁদের বার-বার পরীক্ষায় ফেল-করা পুত্রের অগুণ বাদ দিয়ে শুধু গুণের গুন্‌গুন্ শব্দে যতীন্দ্রনাথের 'মৌচাক'এর আশে-পাশে ঝাঁক বেঁধে এসে তাঁকে তাঁদের পুত্র-গৌরবের হুল ফোটাতে লাগলেন···যতীন্দ্রনাথ জ্বালাতন হয়ে, দেশ থেকে রতন দাসকে আনিয়ে ঠেলে দিলেন তাঁদের দিকে।

চতুর রতন দাস কিন্তু পিছপাও হলেন না। প্রত্যেক পাত্রের পিতাকেই আশার আশ্বাসে রেখে তিনি পিছন দিয়ে একেবারে অন্দরে পাত্রীর মাঠাকুরুণের কাছে হাজির হয়ে তাঁকে তাঁর বক্তব্য নিবেদন ক'রে, হাসিমুখের একটি জোর হর্ষ-নিশ্বাস ফেলে তাঁর মতামত জানবার প্রতীক্ষায় হাতজোড় ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শুনে চন্দ্রিমাদেবীর আনন্দের আর সীমা রইলো না।

সেইদিনই স্বামীর আহারের অবকাশে তিনি কথাটা পাড়লেন, বললেন, "ওসব পাত্রের বাপেদের নগদবিদায় ক'রে তুমি এমন একটি সৎপাত্রের সন্ধান করো, যে গরীব হলেও আমার মেয়েকে দরদ দিয়ে ভালোবাসবে, আর তার সেই ভালোবাসাই গঙ্গাকে মানুষ ক'রে তুলবে—তার মধ্যে চেতনা ফিরিয়ে আনবে।"

"তেমন পাত্র এখুনি পাবো কোথায়?" ব'লে তিনি স্ত্রীর মুখের দিকে চাইতেই চন্দ্রিমাদেবী বললেন, "খুঁজতে হবে না, সে পাত্র তোমার হাতেই আছে।"

যতীন্দ্রনাথ বললেন, "আমার হাতে আছে। কে সে পাত্র ?"

চন্দ্রিমাদেবী বললেন, "সে পাত্র সুব্রত মিত্র।"

যতীন্দ্রনাথ অবাকবিস্ময়ে চেয়ে থাকেন স্ত্রীর দিকে, তারপর চিন্তিতমুখে বলেন, "সুব্রত কি জেনে-শুনে গঙ্গাকে বিয়ে করবে ?"

চন্দ্রিমাদেবী বলেন, "সে ভার নিয়েছেন—রতনবাবু। মনোহর মিত্রকে আর তাঁর ছেলেকে রাজী করাবেন তিনি। তার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না।"

খাওয়া শেষ ক'রে যতীন্দ্রনাথ তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বিশ্রামের জন্যে তাঁর ঘরে চলে গেলেন।

মনের মুকুরে চন্দ্রিমাদেবী দেখলেন ভবিষ্যতের আশার রঙিন্ দৃশ্যাবলী···তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে···সীমন্তে সিঁদুর প'রে তাঁর গঙ্গোত্রী সেজেগুজে ঠিক প্রজাপতির মতই বাড়ীময় ঘুরে বেড়াচ্ছে···সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের মত মানুষ··· সাধারণ সুস্থ মানুষদের মধ্যে সে তার আসন ক'রে নিয়েছে।···

ছায়ার মায়া হলেও মায়ের বুকে একি কম সান্ত্বনা!···

সুব্রতর পিতার কাছ থেকে রতন দাস স্বীকৃতি আনবার পর, স্বামীকে অনুরোধ ক'রে তিনিই পাঠিয়েছেন গত-কাল মনোহর মিত্রের কাছে।

যতীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সেই যে দু'হাতে লজ্জিত মুখ ঢেকে মাথা নীচু ক'রে ব'সে রইলেন মনোহর, সে মুখ আর তুললেন না।

তাঁর লজ্জার কারণটা আন্দাজ ক'রে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থাকবার পর শান্তস্বরে যতীন্দ্রনাথ বললেন, "আজ হঠাৎ দেখা ক'রে যে তোমার কষ্টের কারণ হলুম এজন্যে আমি খুব দুঃখিত। কিন্তু যেজন্যে এসেছি সেটা শেষ না করেও তো উঠতে পাচ্ছি না। অবশ্য তুমি না শুনলেও এখুনি আমায় উঠতে হবে। কিন্তু···"

লজ্জা···লজ্জা···দুর্নিবার লজ্জা। মনোহরের মনে হলো, এই ঘটনা ঘটবার আগে তাঁর মৃত্যু হলো না কেন—কেন তিনি মরণের মুখ থেকে ফিরে এলেন। কিন্তু আজকের এই পরিস্থিতি···মুখের সামনে প্রতীক্ষমাণ এই সম্মানীয় মহাজন···না, ওঁকে আর বিরক্ত করা চলে না···কথা এবার তাঁকে কইতেই হবে।

মুখ থেকে হাত নামিয়ে ক্লিষ্টকণ্ঠে ধীরে-ধীরে মনোহর বললেন, "কিন্তু আমি—আমরা কি করবো, যতীন? কবে তুমি আমাদের বাড়ী ছেড়ে দিতে বলছো?"

স্মিতহাসি হেসে যতীন্দ্রনাথ বললেন, "তুমিই বলো না,

কবে ছাড়লে তোমার কোনো অসুবিধে হবে না—হাসতে-হাসতে তুমি চলে যেতে পারবে।"

"হাসতে-হাসতে ?"...মনোহর এ-কথার জবাব দিতে পারলেন না। কি জবাব দেবেন তিনি ? দরিদ্রের প্রতি ধনীদের এ-বিদ্রূপ তো সৃষ্টির আদিম কাল থেকেই আবহমান সমান চলে আসছে। তবু বললেন, "তুমি যেদিন হুকুম করবে।"

"হুকুম ?" যতীন্দ্রনাথ বললেন, "ঠিক হুকুম নয়, তবে একদিন হয়তো তোমায় অনুরোধ করবো এ-বাড়ী ছাড়বার জন্যে, কিন্তু থাক্ সে-কথা। এখন জানতে চাইছি, বাড়ী ছেড়ে কোথায় যাবে তুমি ?"

দম নিয়ে-নিয়ে মনোহর বললেন, "আবার কোথায় ? মেয়েটাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে, দিদির হাত ধ'রে দাঁড়াবো গিয়ে গাছতলায়—তা ছাড়া আমার আর আশ্রয় কোথায় ?"

যতীন্দ্রনাথ আর-একটু সরে গিয়ে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একখানা লম্বা ভাঁজ-করা কাগজ বের ক'রে বললেন, "এ-কাগজখানা চিনতে পারো ?"

মনোহর বললেন, "হ্যাঁ। ওখানা আমার সই-করা ঋণ-নেওয়ার বন্ধকী-দলিল। বুঝেছি, ভিটে-ছাড়া করবার জন্যে তুমি আমার আর-একটা সই চাও।...দাও, তোমার কলমটা দাও, বলো কি লিখতে হবে আর কোথায় সই করতে হবে ?"

এতক্ষণ পরে হঠাৎ উচ্চহাসি হেসে যতীন্দ্রনাথ বললেন, "সই ?... কলম ?" ব'লে বুকে-আঁটা ঝরণা-কলমটা হাতে নিয়ে

বললেন, "সই আর তোমায় করতে হবে না ভাই, আমিই স্বাক্ষর করছি এই ছাখো :

...এই বন্ধকী-দলিলের সমস্ত টাকা মায়-সুদ নগদ বুঝিয়া পাইয়া সুস্থ শরীরে স্বাক্ষর করিয়া দিয়া, দলিলখানি ঋণ-গ্রহীতা শ্রীযুক্ত মনোহর মিত্রকে ফেরত দিয়া গেলাম। ইতি।

স্বাক্ষর—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু"

লিখে দলিলের কাগজপত্রগুলো মনোহর মিত্রের হাতে দিয়ে বললেন, "এবার তুমিও ঋণমুক্ত—আমিও নিশ্চিন্ত।"

কাঁপতে-কাঁপতে মনোহর টলে পড়ছিলেন, যতীন্দ্রনাথ তাঁর শীর্ণ দেহটা দু-হাতে ধ'রে বললেন, "করছো কি? প'ড়ে গেলে আর বাঁচতে হবে না যে। বোসো, বোসো। তোমায় আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে না। বাল্যবন্ধুতার কথা স্মরণ ক'রে তোমায় ঋণমুক্ত ক'রে গেলুম, এইটুকুই শুধু মনে রেখো। আর পারো তো এবার চিরদিনের জন্যে আমায় ঋণী ক'রে আমার মহাজন সেজে আমার ওপর হুকুম চালিও। সে-কথা পরে। আজ থেকে বাড়ীর মালিক তুমি হলেও, আমার অনুরোধে এ-বাড়ী তোমায় অন্তত কিছুদিনের জন্যে ছাড়তে হবে, যখন রতন রাজমিস্ত্রী সঙ্গে নিয়ে আসবে। তারপর তোমার বাড়ী মেরামত হয়ে গেলে তুমি এসে বাস কোরো। আচ্ছা, আজকের মতন বিদায় দাও ভাই, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে হয়তো তোমার সঙ্গে আমার আবার মিলন হবে।"

এই কথার পর আনন্দাশ্রুসিক্ত চোখে দুই বন্ধু কিছুক্ষণ বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রইলেন, তারপর চোখে অশ্রু, মুখে হাসি নিয়ে যতীন্দ্রনাথ বেরিয়ে গেলেন সেখান থেকে।

তেমনি চোখের জলে ভিজে মনোহর মনে-মনে বললেন, "কে কোথায় আছো জগতের লোক, ছুটে এসে দেখে যাও—শিখে যাও কেমন ক'রে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে হয়।...যার প্রচুর আছে সে—যার কিছু নেই এমন বন্ধুর দুর্দ্দিনে অকুণ্ঠ উদার মুক্ত দু-হাত ভ'রে সাহায্য ক'রে কেমন ক'রে তাকে তার স্বমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে...অভিশপ্ত গরীব-বন্ধুর চোখের জল মুছিয়ে সেই চোখে কেমন ক'রে মুক্তির অমৃতবারির উৎস ছুটিয়ে দিয়ে, নশ্বর-জীবনে অমরত্ব লাভ ক'রে মানুষের মনের মন্দিরে বিরাজ করতে পারে চির দিন—অনন্ত কাল..."

বাইরে অপেক্ষা করছিলেন রতন দাস আর জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী। তাঁদের নিয়ে পথ চলবার সময় রতন দাস বললেন, "কথা যখন পাকা ক'রে এলেন বাবু, তখন কবে নাগাত শুভকাজটা হতে পারবে—মানে, পণ্ডিতকে পাঁজী দেখিয়ে সেটা ঠিক ক'রে ফেলা দরকার কিনা, তাই বলছিলুম—"

বাধা দিয়ে জগন্নাথ বললেন, "বিয়েটা তাহলে বড়কর্ত্তা, এখান হতেই দিতে হয়। কারণ, বিশ বছর হলো আপনি এই জমিদারী কিনেছেন, এতকালের মধ্যে আপনাকে ছাড়া আমরা মা-মণিদের কাউকে আমাদের মধ্যে পাইনি, এখানে

আপনার ক্রিয়াকর্ম্মও কিছু হয়নি কোনোদিন। আমরাও তো আশা করতে পারি যাতে এত-বড় বিরাট কার্য্যটা এখান হতেই সমাধা হয়।"

"অবশ্য পারেন। আশীর্ব্বাদ করুন চক্রবর্ত্তীমশাই, মেয়েটি আমার যেন জীবনে সুখী হয়। আপনাদের আশা পূর্ণ করবার চেষ্টা আমার খুবই রইলো।" ব'লে রতন দাসের দিকে ফিরে যতীন্দ্রনাথ বললেন, "একটা বড় ভুল ক'রে ফেলেছি রতন! আজ এগারোটার সময় শ্রম-মন্ত্রীর সঙ্গে এন্‌গেজমেণ্টের কথাটা আমার মনেই ছিল না। তোমার মাঠাক্‌রুণের জিদে প'ড়ে এখানে এসেছিলুম বটে, কিন্তু বিকেলে না গিয়ে—তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমায় এখুনি যেতে হবে। শোফারকে খবর দাও, এখানেই ততক্ষণ অপেক্ষা করছি আমি।...আর ছাখো, মনোহরের কাছে তোমার আর যাওয়ার দরকার নেই, আমাদের মধ্যে পাকা কথা হয়ে গেছে—বন্ধকী-দলিলটা আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়ে এসেছি। বাড়ী সম্বন্ধে তার সঙ্গে আর কোনো কথা কইবে না এ-কথাটা মনে থাকে যেন।"

রতন দাসের ডাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই মোটর আসতে, গাড়ীতে উঠে যতীন্দ্রনাথ কলকাতার দিকে রওনা হলেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজের প্রচুর আয়োজনটা নষ্ট হওয়ার জন্যে রতন দাসের আক্ষেপের আর অবধি রইলো না।

তেমনি আক্ষেপের নাকি-সুরে নস্য নিতে-নিতে চক্রবর্ত্তী-

মশাই বললেন, "হায়-হায়-হায়-হায়-হায়। বড়কর্ত্তার মেয়ের বিয়ের আনন্দে আমি কি ভুলটাই না ক'রে ফেললাম রতন! মতিভ্রম আর কাকে বলে? অ্যাঁ! এই সকালবেলা...লোক্সান ব'লে লোক্সান—"

রতন দাস বললেন, "মানে? মতিচ্ছন্ন আবার কিসে হলো আপনার?"

দারুণ চটে গিয়ে জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী বললেন, "সব কথার 'তালে'ই তোমার ওই এক 'তেহাই'—ওই 'মানে'। আরে বাপু, আমার 'মতিচ্ছন্ন' হয়েছে কে বললে তোমায়? ভ্রম—ভ্রম—মতি-ভ্রম। নিজে তুমি সংস্কৃত-কথার মানে বোঝো না, অপরকে সব সময় মানে ভেঙে দিতে যাও।"

হাসতে-হাসতে রতন দাস বললেন, "তাঁর মানে এই যে, যার সঙ্গে যখন কথা কই, সে বুঝতে না পারলেই আমায় তার অর্থ ভাঙতে হয়—অত চটেন কেন?"

চক্রবর্ত্তীমশাই বললেন, "জোর আঁচ দাও ব'লে। চটি কি আর সাধে? নইলে রোজই তো শুনি তুমি অর্থ ভাঙছো—যাবজ্জীবন ভাঙবেও। কবে আমি তার কদর্থ করতে গেছি? আবার বলে কিনা, 'অত চটেন কেন?' সেই যে কোন্ শাস্ত্রে না কেতাবে লেখা আছে, দুর্ব্বাসার মত ক্রোধী এক মুনির কাছে গিয়ে একটা চণ্ডাল তাঁকে বিদ্রূপ ক'রে ক্ষেপিয়ে দিয়ে অনর্থ ঘটিয়েছিল...বলেছিল—

...অগ্নিগর্ভ রে পর্ব্বত, খাবে কি সরবৎ?...

শুনে দারুণ ক্রোধে মুনির ধ্যান ভঙ্গ হতেই তিনি ত্রিনয়ন খুলে সর্ব্বভূকের কল্যাণে তখনি তাকে ভস্ম ক'রে ফেলেছিলেন, তোমার হয়েছে ঠিক তদ্রূপ। তোমার শ্রীমুখে ঠাণ্ডা মিছরীর পানা আছে কিনা, তাই কারুর 'চটা' নিষেধ। ঘোর কলিতে আমাদের চোখ দিয়ে আর আগুন ঠেক্‌রায় না তাই বেঁচে গেলে।"

মৃদু হেসে রতন দাস বললেন, "চোখে আগুন না থাক্, কলির বামুনের মুখে আগুন তো আছে। তাইতে আমায় দগ্ধ ক'রে সেই ভস্ম গায়ে মাখলে আপনার অঙ্গের 'বিভূতি' হতে রাজী আছি। যাক্, এখন আপনার লোক্‌সানের কথাটা জানতে পারলে আমি সেটা পূরণ ক'রে দেবার চেষ্টা করতে পারি।"

..."পারো? পারো?" একগাল হেসে ঠাণ্ডা-মেজাজে জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী বললেন, "তা আর পারবে না কেন, সবই তো তোমার হাতে। আরে, সত্যিই কি আমার ক্রোধ হয়েছে তোমার প্রতি? এতক্ষণ আমি শুধু 'মস্করা' করছিলাম। কথাটা এমন কিছু নয়, এই শোনো। বিবাহ কার্য্যটা যাতে সামনের বৈশাখ মাসেই সম্পন্ন হয়ে যায় সেইজন্য হাজার-একটা তুলসী শ্রীনারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে নিয়ম ক'রে প্রত্যহ হাজার বার ক'রে দিতে হয়েছে আমায়, তবেই-না আজ বিবাহের পাকা চুক্তিটা হয়ে গেল! তা ভালোই হলো। কিন্তু আমার তুলসী-দেওয়ার পাওনাটা চুক্‌লো কৈ রতন?"

রতন দাস এবার উচ্চহাসি হেসে বললেন, "কত আপনার পাওনা হবে তার জন্যে চক্কোত্তিমশাই?"

"হেঁ-হেঁ, কত আর? তুমি যা দেবে বাবা রতন। ···দশ দাও···বারো দাও···অত না দাও, দু-এক টাকা কম দাও, তাই হাত পেতে নিয়ে তোমায় আশীর্ব্বাদ করবো।"

"বেশ, ওবেলা কাছারীতে যাবেন, আপনার প্রাপ্য চুকিয়ে দেবো।" ব'লে রতন দাস বাড়ীর পথে চললেন।

চক্রবর্ত্তীমশাই 'বেনিয়ান'এর ভেতর থেকে পৈতেগাছা বের ক'রে হাতে নিয়ে আশীর্ব্বাদ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রতন দাসকে চলে যেতে দেখে অনর্থক আর সে-ঝঞ্ঝাট না ক'রে সাফল্যের আনন্দে নিজের মনে হাসতে-হাসতে ভাবতে-ভাবতে চললেন···আরো কিছু বেশী ক'রে বললেও রতনা বেটার কাছ থেকে ঠিক আদায় হতো। কিন্তু মুখের কথা ফস্ ক'রে একবার বেরিয়ে গেলে তাকে আর ফিরিয়ে আনে কার সাধ্য।

*

*   *

ফাগুনের শেষ। রোদের ঝাঁজে সারাদিন আগুনের উত্তাপ সহ্য করার পর বিকেলের দিকে ভ্রমণবিলাসীর দল দিগ্‌বিদিকে বেরিয়ে পড়েছে নিজেদের খুশির খেয়ালে।

কলকাতায় গড়ের মাঠের দিকে-দিকে স্বাধীন ভারতের সব বয়সের নর-নারীর অবাধ বিচরণ, আর ভাগা-দিয়ে-বসা নানা-

রকম আলাপ-আলোচনার কলগুঞ্জনে মশগুল টুক্‌রো মজলিস থেকে খানিক-খানিক তফাতে-তফাতে ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়ে, কিংবা কোনো নির্জ্জন গাছের তলায় মুখোমুখী ব'সে তরুণ-তরুণীরা তাদের কথার ফাঁকে মাঝে-মাঝে এমন উচ্চ-হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ফেটে পড়ছে—দূর থেকে দেখলে মনে হবে, কি মজার কথাই না-জানি কইছে ওরা।

হয়তো তাই। হয়তো মানুষের হিংসা-দ্বেষ-শঠতার সকল নিষ্ঠুরতা এড়িয়ে—সারাদিনের ঘুমন্ত বসন্ত জেগে ওঠার এই পরম ক্ষণে ঝিরঝিরে বাতাসে ভাসতে-ভাসতে শ্রান্ত জীবনটাকে ওরা কাব্যময় ক'রে তুলেছে তাই ওদের মুখে হাসির অমন অনাবিল উৎস···

কিন্তু বেশীক্ষণ এ আনন্দ উপভোগ করতে পারলে না কেউ। সবুজের এই শ্যাম সমারোহের আসরে প্রকৃতির লীলা-নাট্যে পট পরিবর্ত্তন হয়ে সহসা কালবৈশাখীর তাণ্ডব সুরু হয়ে গেল।···মিষ্টি বাতাস ঠেলে উঠলো তুমুল ঝড়··· মেদুর আকাশে বেজে উঠলো গুরুগুরু মেঘের মাদল··· তীরের মত বৃষ্টির বড়-বড় ফোঁটা ছিট্‌কে প'ড়ে জানিয়ে দিলে, আকাশ ফেঁসে এখুনি জল নামবে মূষলধারে, মাঠের মানুষরা সাবধান!

ওদিকে অনেকক্ষণ আগে প্রায় সব অফিসেই ছুটি হয়ে গেছে, কেবল অতিরিক্ত কাজের 'উপরি'-রোজগারীরা এতক্ষণ পরে সবে মাত্র ছুটি পেয়ে ঘরমুখো হবে, এমন সময় ঝমাঝম্

বৃষ্টি নামতেই সবার সঙ্গে তারাও ছুটতে আরম্ভ করেছে। সেই ছত্রভঙ্গ দলের 'ছত্র'হীন ছুটি ছোক্‌রা-কেরানীকে দেখা গেল, বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাবার জন্যে তারা একটা ক'রে 'উডপেন্সিল' মাথার ওপর বেঁকিয়ে ধ'রে ছাতার কাজ চালিয়ে নেয়ার আনন্দে হৈ-হৈ করতে-করতে ছুটতে আরম্ভ করেছে। মোট কথা, এই দুর্য্যোগেও বেশী পয়সা কামানোর জন্যে তাদের আনন্দের আর কামাই নেই···

ছুট্···ছুট্···ছুট্···ছুট্। অত-বড় গড়ের মাঠটা জনমানব শূন্য হয়ে গেল মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে। জল তখন খুব তোড়ে পড়ছে। এ-জল আর শীগগির থামবে না বোধ হয়। তা না থামুক্, আজকের এই ভিজে ঝ'ড়ো বাতাস, সর্ব্বগ্রাসী অন্ধকার আর মেঘমেদুর আকাশের নীচে বর্ষণমুখর জলপ্রপাতের অবিরাম একঘেয়ে ঝম্‌ঝম্ শব্দ মানুষের মনে বৈরাগ্যের যে আবহ সৃষ্টি করেছে তা উপভোগ করবার মত। অন্তত সুব্রত তাই ভাবছিল।

চাকরির জন্যে মালিকের সঙ্গে দেখা করবার আশায় বেলা চারটেয় বেরিয়ে পায়ে-হেঁটে চৌরঙ্গীর রাস্তা ধ'রে যাচ্ছিলো সুব্রত, এমন সময় প্রকৃতির এই দুর্য্যোগে বাধ্য হয়ে তাকে দক্ষিণ-কলকাতা প্রবেশের সিংহদ্বার ভবানীপুরের মুখে বিখ্যাত ডাক্তার সেনগুপ্তের চেম্বারের বিরাট প্রাসাদের বারান্দার নীচে আশ্রয় নিতে হয়।

এদিকে 'পেন্সিল-মাথায়-দেয়া' সেই নবীন কেরানী দু'জন

আসন্ন বৃষ্টির মুখে ছুটতে-ছুটতে গিয়ে সেই যে বাসে উঠেছিল, ডাক্তার সেনগুপ্তের চেম্বারের কাছাকাছি গিয়ে এক কোমর জল ঠেলে যেতে না পারার দরুন সে গাড়ীর কল বিকল হয়ে যাওয়ায়, তারাও বাধ্য হয়ে বাস থেকে নেমে সুব্রতর পাশে একটু স্থান ক'রে নিয়েছে। সেই ছুটি কেরানীবাবুর নাম সুব্রত না জানলেও তাদের একজনের নাম ধর্ম্মদাস, আর-একজনের নাম নরহরি।

দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যেও সুব্রত শুনলে, নরহরি বলছে, "যতই 'ট্রাই' করি ভাই, হরে-দরে সেই হাঁটুজল। একঘটি জল তুমি সমুদ্দুর থেকেই নাও আর পাতকো থেকেই তোলো, জলের ওজন তাতে আর বাড়বে-কমবে না। সারাদিন গাধার খাটুনি খেটে ভাবলুম, 'ওভারটাইম' ক'রে বাড়তি-পয়সাটা নিয়ে যাই, রাত্তিরে মজেসে মাংসের ঝোলে কব্জি ডোবাবো— হরি-হরি! তার বদলে আজ রাত্রে শাকসব্জীর ঝোল দিয়ে নিরিমিস্যি ভাত খেয়েই দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হবে বুঝছি।"

ধর্ম্মদাস বললে, "ধ্যেৎ! মাংস খেয়ে কি হবে? আমি 'ওভারটাইম' খাটলুম, একসঙ্গে মবলগ কিছু মারবো ব'লে। এখন দেখছি, কালকের শনিবারটা আমারও বৃথাই যাবে।"

নরহরি বললে, "কি রকম?"

ধর্ম্মদাস বললে, "তোকে বলতে আর বাধা কি! শোন্: এক প্রবীণ ভদ্রলোক—এমেচার, কারুর কাছেই পয়সা নেন্ না, আর কাউকে বলেও দেন্ না তাঁর 'সিওর টিপ্'।

আমায় খুব স্নেহ করেন তাই ভাবলুম, 'এক্সট্রা' রোজগারের এই ক'টা টাকায় ভীম নাগের দোকান থেকে কিছু সন্দেশ কিনে নিয়ে গিয়ে তাঁকে দিলেই বাস্, মার দিয়া কেল্লা!"

নরহরি বললে, "অত চেল্লাস্নি ভাই, একটু আস্তে-আস্তে বল্ ব্যাপারটা কি।"

হাসতে-হাসতে ধর্ম্মদাস বললে, "ব্যাপারটা হচ্ছে, হাতি আর ঘোড়ার মধ্যে ঐ শেষেরটা। জগৎ জুড়ে যেখানে যত ঘোড়া আছে তার ঠিকুজি-কোষ্ঠী সব তাঁর নখদর্পণে। সেদিন তিনি আমায় বলেছেন, কালকের যে ঘোড়াটার নাম ব'লে দেবেন তার ঠাকুরমা জন্মেছিল অষ্ট্রেলিয়ায় আর ঠাকুর্দ্দা বার্লিনে। তাদের ছেলে আবার রাণাপ্রতাপের 'চৈতক'-এর মতন মিনিটে মাইল দৌড়োতো, আবার তার ছেলে একেবারে স্বয়ং পক্ষীরাজ!...'ডবল-টোট্' খ্যালো, 'ট্রিবল্-টোট্' খ্যালো... উড়তে-উড়তে সব ঘোড়াকে ডিঙিয়ে 'উইন্' সে করবেই, আর 'উইন্' করা মানে, পাঁচ টাকায় একদানে পঞ্চাশ হাজার টাকা। তাহলেই শনিবার সকালে যে ফকির, পরের দিন রবিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে সে একেবারে বাদশা 'আবুহোসেন'—বুঝলি? কিন্তু ঘোড়ার নামটা কি আর পাবো? ভদ্রলোক সন্ধ্যের সময় 'ইভনিং-ওয়াক্' করতে বেরিয়ে তার পরদিন একেবারে 'মর্ণিং-ওয়াক্' ক'রে বাড়ী ফেরেন শুনিছি, তাই ভাবছি—"

নরহরির কেমন কৌতূহল হলো, বললে, "ভদ্রলোকের নামটা কি?"

চুপিচুপি ধর্ম্মদাস বললে, "প্রকাশ গুপ্ত।"

নামটা শুনে নরহরি বললে, "তাঁর টিপ্ কক্‌খনো মিলবে না, দেখিস্।"

ধর্ম্মদাস বললে, "কেন, কি হলো?"

নরহরি বললে, "কারণ, আসল কথা প্রকাশ না ক'রে তিনি গুপ্ত রাখেন। তাঁর নাম 'গুপ্ত প্রকাশ' হ'লে দেখতিস্ তাঁর 'টিপ্'-এ তোর 'লাক্' ফিরে যেতো।"

এবার বক্তা ও শ্রোতা ছুই বন্ধুই উচ্চহাসি হেসে উঠলো।

নরহরি কিন্তু ভাবছিল, বেশ একসঙ্গে এক-অফিসে কাজ করছে ছু'জনে, মাঝে থেকে ওর বন্ধুটা হঠাৎ এত বড়লোক হয়ে যাবে! তাই আগের কথার জের টেনে এনে বললে, "আচ্ছা, অত টাকা পেয়ে তুই করবি কি রে—য়্যাঁ?"

ধর্ম্মদাস বললে, "টাকা পেলে করবার কাজ অনেক-কিছু আছে রে ভাই! ধর্, সত্যি যদি আমি অত টাকা পাই, অবশ্য তাঁর অব্যর্থ 'টিপ্'-এর জোরে পাবোই একদিন-না-একদিন, আমি ভেবে রেখেছি, প্রথমেই দর্জ্জির দোকানে অর্ডার দিয়ে ছোট-ছোট থলি গাদাখানেক তৈরী করিয়ে নেবো। তারপর—"

বলেই বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে সে হাসতে-হাসতে বললে, "তারপর কি করবো বল্‌দিকিন্?"

নরহরি বললে, "তারপর কিনবি একটা গডরেজের নিউ মডেলের আয়রন্‌সেফ্ আর সেই থলিগুলোতে টাকা ভর্ত্তি

ক'রে তাইতে তুলে রাখবি, তারপর নির্জ্জন ঘরে খিল দিয়ে নিরালায় ব'সে সেইসব থলি ঝেড়ে টাকাগুলো বের ক'রে রোজ একবার ক'রে গুণবি আবার তুলবি—চশমখোর কিপ্‌টে লোকগুলো পেটে না খেয়ে যা ক'রে থাকে তাই করবি, আবার কি করবি ?"

বন্ধুকে একটা জোর ধাক্কা দিয়ে ধর্ম্মদাস বললে, "দূর্ বোকা ! আমি কি করবো জানিস্ ? শোন্। 'আরব্যউপন্যাস'-এর সেই আদ্যিকালের 'হারুণ-অল-রসিদ' বাদশা যা করতেন তাই করবো।···রোজ রাত্রে টাকা-ভর্ত্তি দু-চারটে থলি সঙ্গে নিয়ে ছদ্মবেশে ঘুরে-ঘুরে দেখবো কোথায় কে সত্যিকারের অভাবী আছে—বিশেষ ক'রে ছেলেপুলে নিয়ে বিব্রত ভদ্রঘরের অনাথা বিধবা আর গরীব-গেরস্তঘরের সত্যিকারের দুঃখী—যারা বংশের গৌরব বজায় রাখবার জন্যে পরের দোরে হাত পাততে না পেরে মুখ বুজে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য ক'রে-ক'রে না খেতে পেয়ে শেষে যমের মুখে নিজেদের ধ'রে দেয় তবু ভিক্ষে করতে পারে না—সন্ধান নিয়ে-নিয়ে সন্ধ্যের পর রোজ তাদের বন্ধ-ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে নিজের কানে তাদের দুঃখের কাহিনী শুনবো, শুনে জানলা দিয়ে 'টুপ্' ক'রে একটি টাকা-ভর্ত্তি থলি হঠাৎ তাদের ঘরের মধ্যে ফেলে দিয়েই স'রে পড়বো সেখান থেকে। তারপর তাদের মাঝে-মাঝে বাড়ীতে ডাকিয়ে যাতে কাজের মধ্যে দিয়ে বারো মাস তারা নিজেদের চালিয়ে নিতে পারে সাধ্যমত সেইরকম ব্যবস্থা ক'রে দেবার চেষ্টা করবো,

কিন্তু আপাতত আর এখানে বসা নয়। ঐ ছাখ্, আকাশের গুণ্ড ক্রমেই বিকাশের উপক্রম করছে, এবার ওঠা যাক্।"

প্রায় একঘণ্টা অবিশ্রাম ধারা পাতের পর আকাশটা একটু বিশ্রাম নিতে চাইছে দেখে দুই বন্ধু উঠে সেই টিপিটিপি বৃষ্টি মাথায় ক'রে পথ চলতে সুরু করলে।

সুব্রত কিন্তু তখনো ব'সে রইলো। তার কারণ ও জানে, 'একমেবং দ্বিতীয়ম্'। ওরা বাড়ী গিয়ে ভিজে-কাপড় বদ্‌লাবে, কিন্তু ওর সম্বল শুধু যে বস্ত্রখানি ওর অঙ্গে আছে। ভিজে-কাপড়ে বাসায় গেলে সেই ভিজে-কাপড়ই গায়ে শুকিয়ে ওকে রাত কাটাতে হবে। তার চেয়ে আরো খানিক দেখা যাক্। কিন্তু বেশীক্ষণ অপেক্ষা করাও তো চলে না আর। আবার যদি চেপে জল নামে? তখুনি সে-কথা চাপা দিয়ে ভাবলে, ওর চেয়ে ওই বন্ধু দুটি কত সুখী? একটা চাকরির জন্যে ছ'মাস আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে ও তুচ্ছ অন্ন-বস্ত্র সংস্থানের কোনো উপায়ই করতে পারেনি, আর ওরা দৈনন্দিন পরিশ্রমের অর্থ থেকে সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রেখেও সঞ্চয় করে, তারপর উপরি-রোজগারের পয়সায় বিলাসের খেয়াল মেটায়। কিন্তু সেই বিলাসিতার মধ্যেও ওদের যে উচ্চ উদার মন আর সদিচ্ছার পরিচয় পেলে সুব্রত, তাতে ও নিজেকে ধিক্কার না দিয়ে পারলে না। ছি ছি, ধিক্ ওর শিক্ষার গর্ব্বে আর ধিক্ ওর জীবনে। না, আজ একটা হেস্তনেস্ত না ক'রে ও আর বাসায় ফিরবে না।

উঠলো সুব্রত। উঠতেই সামনে দেয়ালে-আঁটা আরশিতে নিজের চেহারা আর পরিধেয় দেখে ও নিজেই অবাক হয়ে গেল। কতকাল যে মাথার ঐ ঝাঁকড়া চুলে চিরুনি পড়েনি··· ঈষদ্‌স্মিত মিশ কালো চাপদাড়ি আর গোঁফে, টক্‌টকে ফর্সা মুখখানিকে ওর এমন ভাবে ঢেকে রেখেছে যে, খুব নিকটাত্মীয় না হ'লে হঠাৎ দেখে কেউ চিনতেই পারবে না ওকে। তবে এও একটা সুবিধের কথা এখন ওর পক্ষে।

হাঁটুর উপর কাপড় তুলে, 'বাটা'র স্লিপারটি বাঁ-হাতে নিয়ে চৌরঙ্গী রোড ধ'রে দক্ষিণদিকে কিছু পথ গিয়েই বাঁয়ে এলগিন রোডে ঢুকে সুব্রত দেখলে, সারা রাস্তাটা জলে একেবারে টইটুম্বুর। তারপর পূবমুখে সোজা ল্যান্সডাউন রোডের দিকে চপাং-চপাং ক'রে পা ফেলতে-ফেলতে খালি-পায়ে সন্তর্পণে এগুতে লাগলো। সতর্ক দৃষ্টিতে দেখতে-দেখতে, 'নেতাজী-ভবন' পেরিয়ে রাস্তার শেষপ্রান্তের কাছাকাছি একটা প্রকাণ্ড বাগান-বাড়ীর গেটের গায়ে 'নেম-প্লেট' দেখে এতক্ষণে ও থামলো। কিন্তু এ-বাড়ীতে ও ঢুকবে কেমন ক'রে? ওর এই ছিন্ন মলিন বেশ দেখলেই তো দরোয়ানরা দূর-দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে। তাহলে উপায়? এতটা পথ এত কষ্ট ক'রে হেঁটে এসে এখন ফিরে যাবে? না। আবার চপাং-চপাং করতে-করতে রাস্তাটার ওপারে বিপরীত ফুটপাতে গিয়ে দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো কি উপায়ে এখন ঐ বাড়ীর মধ্যে ঢুকবে ও।

উপায় একটা হলো। আবার টিপ্-টিপ্ ক'রে জল পড়ছে দেখে দরোয়ান তার টুলটা নিয়ে ফটকের পাশের ছোট ঘরটিতে ঢুকতেই অসদুপায়ের সুযোগ নিলে সুব্রত। চুপিসারে ঢুকে প'ড়ে দক্ষিণের সারিবদ্ধ পামগাছের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে ব'সে রইলো নিথর হয়ে। কিন্তু চারদিকের লাইট-পোষ্টে চোখ-ঝলসানো তীব্র বিজলীর আলোগুলো তখন জ্বলে উঠেছে। সেই আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, দূরে একটা চারদিক-ফাঁকা বাংলো-প্যাটার্ণের সুদৃশ্য দোতলা বাড়ী···ছ'পাশে কেয়ারি ক'রে ছাঁটা মেহেদিগাছের বেড়ার মাঝখান দিয়ে সেই বাড়ীর গাড়ীবারান্দা পর্য্যন্ত সোজা চলে গেছে লাল কাঁকর-ঢালা সরু পথ, তার একপাশে গ্যারেজ, চাকরদের বস্তি, খেলার লন, আর-একপাশের জমিতে হরেক রকম সুগন্ধি দেশী ফুলের আর বাহারী বিলিতি মরশুমী ফুলের গাছের সমারোহ···

এভাবে এখানে আত্মগোপন ক'রে থাকলে অপদস্থ হবার আশঙ্কায় একটা কামিনীকুঞ্জের আড়ালে ও লুকিয়ে ব'সে রইলো। অত-বড় মার্চেন্ট-অফিসের কর্ণধার এ-বাড়ীর মালিক মিঃ সেনের সঙ্গে দেখা ও আজ করবেই। অনেক হাঁটাহাঁটি ক'রে দরোয়ানের সঙ্গে অনেক কথা কাটাকাটি, অনেক সাধ্যসাধনা করেও অফিসের ভেতর গিয়ে সেন-সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে না পেরে, শেষে মরিয়া হয়ে সেদিন বিকেলে তিনি বেরিয়ে মোটরে ওঠবার সময় সেখানে দাঁড়িয়েই তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে ওর নিবেদন জানিয়েছিল···দরখাস্ত মঞ্জুরের চিঠি

পেয়েও আজপর্য্যন্ত চাকরি না পাওয়ার জন্যে সবিনয়ে প্রার্থনা করেছিল ওর বিষয়ে তাঁকে অবহিত হবার জন্যে, তিনি আশা দিয়েছিলেন, সময় মত অন্যদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তারপর, দরোয়ানদের তিনি হুকুম দিয়ে যান যেন তারা ঢুকতে দেয় অফিসের ভেতর সেই প্রার্থনাটা জানাবে, এমন সময় ষ্টার্ট দিয়ে শোফার মোটর নিয়ে চলে গেছলো···বলা তার আর হয়নি সেদিন, তাই বাড়ীতে দেখা ক'রে সব কথা খুলে বলা সমীচীন মনে ক'রে এই দুঃসাসিক কাজে এগিয়েছে ও আজ।

এতক্ষণ অবিরাম বৃষ্টির পর এই মেঘ-ঢাকা সন্ধ্যা ওকে সাহায্য করেছে আজ—আজ নিশ্চয়ই সাহেব বাড়ীতে একা আছেন, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ওর মনের কথা আজ ও বলতে পারবে যে, বাঙালীকে বাঙালী না দেখলে আর দেখবে কে? গ্র্যাজুয়েট না হয়েও ভিন্ন দেশের কয়েকজন প্রার্থী যোগ্য ব'লে বিবেচিত হয়ে এবারে কাজ পেয়েছে, আর ও শুধু বাঙালী বলেই কি রইলো এত পেছনে প'ড়ে? কেন?···

কামিনীকুঞ্জের ঝোপ থেকে বেরিয়ে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলতে-ফেলতে গাছপালার আড়ালে খুব সন্তর্পণে পায়ে-পায়ে এগিয়ে চললো সুব্রত।

ঐ সামনের বাড়ীর দোতলায় সবুজ রঙের 'ডিষ্টেম্পার'-দেওয়া ঘরে জালি-পরদার আড়ালে নীল বাল্বের আলো জ্বলছে। কি সুন্দর দেখাচ্ছে এখান থেকে। কিন্তু মানুষকে মুগ্ধ করবার মত যত মোহিনী মায়াই থাকুক ঐ সবুজের, ওতে আকৃষ্ট হয়ে

কাব্য করা চলবে না এখন সুব্রতর। কঠোর কর্ত্তব্যের আহ্বানে চলেছে ও, ওর চোখে জেগে থাক্ শুধ্ বাস্তব। ওই ঘরে এখন মনের সুখে বিশ্রাম করছেন সেনসাহেব, তাঁর সামনে একবার কোনোরকমে পৌঁছোতে পারলে হয়। তারপর···

অদৃষ্টের পরিহাস। তার আগেই ঐ ঘর থেকে কার কোমল করাঙ্গুলীর পেষণে ভিজে-বাতাসে কাঁপতে-কাঁপতে ডুক্‌রে কেঁদে উঠলো অরগ্যানের কোমল পরদায় বুক-কাঁপানো সুরলহরী···মূর্ত্ত হয়ে উঠলো সেই সুরের ভাষা···সে ভাষায় শুধ্ ব্যথা। সে বেদনা সে-ই প্রকাশ করতে পারে যে দরদ দিয়ে গাইতে জানে। কোন্ তরুণী গাইছে কে জানে :

সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে
দিবস গেলে করব নিবেদন,
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন···

মুহূর্ত্তের জন্যে সুব্রত একবার থম্‌কে থামলো···আবার চলতে সুরু করলে···আবার শুনলে :

অনেক দিনের অনেক কথা ব্যাকুলতা
বাঁধা বেদনডোরে,
বুকের মাঝে উঠেছে আজ ভ'রে···

সুব্রত ভাবলে, এ মন্দ নয়। ওপরের ওই যাদুঘর থেকে অদর্শনার সুকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের ব্যথার গান শুনে মোহিত হওয়া, অভাবের তাড়নায় চাকরির মোহে চোরের মত লুকিয়ে

এসে অপরের বাড়ীর মধ্যে অনধিকার হানা দেয়া—মোট কথা, সব দিক দিয়েই আজকের এই পরিস্থিতি ওর অবস্থার সঙ্গে বেশ খাপ খেয়েছে। হাসবে কি কাঁদবে ও ঠিক করতে পারে না, পায়ে-পায়ে এগিয়ে চলে। সেই সময় সহসা আকাশ চিরে বিদ্যুতের একটা হিজিবিজি চমকে একে-বেঁকে মিলিয়ে যেতেই কার তীক্ষ্ণ আহ্বানে ও চমকে উঠে দেখলে, সামনের দরজার পরদা সরিয়ে বেরিয়ে আসতে-আসতে একটি তরুণ যুবকও চমকে উঠলো ওকে দেখে।···

তারপর আর না এগিয়ে, হাত ঘুরিয়ে দু-হাতে পেছনের পরদাটা মুঠো ক'রে ধ'রে সে সেখান থেকেই বলতে লাগলো, "কে তুমি? কি চাও? এখানে এলে কি ক'রে? শীগগির কথা কও, নইলে—"

লজ্জিত-বিনয়ে সুব্রত বললে, "আমায় দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই ভাই, আমি এসেছি সেনসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে।"

যুবকটি ব'লে উঠলো, "মাই গড্! ভয় পেয়েছি আমি? তোমায় দেখে? হেঃ, ভয়। যাক্, সেই আনন্দেই থাকো তুমি। কিন্তু সাহেব কি ক'রে বললেন তোমায় এসময় বাড়ীতে আসতে? বাড়ীতে তো তিনি এমন সময় কারুর সঙ্গেই দেখা করেন না—বিশেষ ক'রে তোমার মতো এইরকম একটা কিম্ভূতকিমাকার লোকের সঙ্গে। তুমি বলছো কি হে—অ্যাঁ? তিনি যে বলেছেন তার কিছু প্রমাণ আছে তোমার কাছে?"

সুব্রত বললে, "না। তেমন প্রমাণ কিছু সঙ্গে নেই আমার।"

দারুণ উত্তেজিত হয়ে যুবকটি বললে, "তবে? তবে তুমি ঢুকলে কি ক'রে বাড়ীর মধ্যে। দরোয়ানরা কেউ বাধা দেয়নি গেটে?"

"দরোয়ানরা কেউ দেখতে পায়নি আমায়, আর আমিও গেটে দেখিনি তাদের" ব'লে সুব্রত আরো কি বলতে যাচ্ছিলো, ওকে থামিয়ে দিয়ে যুবকটি ব'লে উঠলো, "সে কি? গেটে কেউ পাহারা ছিল না? মিথ্যুক্, তাহলে নিশ্চয় চুরি ক'রে ঢুকেছো তুমি। মতলবখানা কি তোমার?" বলেই সে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়···মনে পড়ে আজকালকার ভীষণ ডাকাতির কথা। তবে কি—তবে কি—

ওকে ইতস্তত করতে দেখে ওর মনের ভাবটা আন্দাজ ক'রে নিয়ে 'লজিক'-এর মেধাবী ছাত্র সুব্রত বললে, "আবার বলছি, ভয় পাবেন না, আমি চোর-ডাকাত নই। বিশ্বাস না হয় আপনি সেনসাহেবকে খবর দিন—সেদিন অফিসের গেটে যে ছেলেটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে এসেছে আর আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। তাতে তিনি কি বলেন শুনলে তো সন্দেহ মিটবে আপনার?"

এ-কথা শুনে যুবকটি কতকটা আশ্বস্ত হয়, তবুও বলে, "তোমার কথা কি ক'রে বিশ্বাস করি বলো তো? আজ রাত্রে তাঁর বাড়ী ফেরাটা 'আন্সার্টেন্'···রাত দশটা-এগারোটার

আগে বাড়ী ফিরবেন না জেনেও তোমায় আসতে বলেছেন কি ক'রে? এই ভরসন্ধ্যেবেলায় বেশ একটি মূর্ত্তিমান্ হেঁয়ালি এসে হাজির হয়েছো দেখছি আমার সামনে।"

সেনসাহেব বাড়ী নেই শুনে এতক্ষণ পরে সুব্রত হতাশ হয়ে পড়লো। মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে থেকে বললে, "হয়তো মনে ছিল না তাঁর। যাক্, তিনি ফিরলে দয়া ক'রে বলবেন যে, চাকরির জন্যে যাকে দেখা করতে বলেছিলেন সে আজ এসে ফিরে গেছে, সামনের রবিবারে আবার আসবে ব'লে গেছে" ব'লে একটা নমস্কার ক'রে ফিরতেই যুবকটি ব'লে উঠলো, "যেও না, যেও না, দাঁড়াও। কি বললে? চাকরি—না? আই সী। কৈ, এ-কথা তো আগে বলোনি? ...ইয়েস্, ইয়েস্, চাকরি একটা খালি আছে বটে, তবে তার জন্যে আর সাহেবকে দরকার হবে না, দিদিমণিই তোমায় এ্যাপ্অয়েন্ট ক'রে নিতে পারবেন—রোসো, রোসো। আচ্ছা ঐ বেঞ্চে একটু বোসো। আমি খবর দিচ্ছি দিদিমণিকে।"

এতক্ষণে যুবকটির সাহস ফিরে আসে। বুঝতে পারে, চাকরির উমেদারী ছাড়া ডাকাতির সঙ্গে কোনো সংশ্রব নেই এর। তাই পরদাটা ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে এসে সুব্রতর কাপড়-জামা পরীক্ষা করে। ...না! অস্ত্রশস্ত্র তো দূরের কথা, তামার একটি পয়সাও সঙ্গে নেই এর।...আপন মনেই গজ্গজ্ করে, "এই তো কোমর, ট্যাঁক, পকেট টিপে-টিপে দেখছি শুধু ভ্রমর গুঞ্জন হচ্ছে—পকেট ভোঁ-ভোঁ।"

তারপর ওকে অপেক্ষা করতে ব'লে, দরজার পরদা সরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যায় যুবকটি।

*

* *

বেঞ্চে ব'সে ভাবে সুব্রত :

…বাড়ীতে ওদিকে কি হচ্ছে কে জানে! এতদিনের মধ্যে মাত্র একদিন ও কাশিমপুরে গিয়েছিল বাগান-পুকুর বিক্রির সেই ওর সই-ক'রে-নেয়া পঞ্চাশটা টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বায়নার দলিলটা বাতিল করবার জন্যে, সেইসময় যা লোকের মুখে শুনে এসেছে, সবাই ভালো আছে। কল্যাণী তখনো বাড়ীতে ছিল, এখন বোধহয় শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে, তার জন্যে ভাবনা নেই, ভাবনা এখন শুধু রুগ্ন বাবা আর পিসীমার জন্যে।…

একান্ত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তিনটে টিউসানির সামান্য আয় থেকে মেসের বিল মিটিয়ে মাসের শেষে এমন কিছু থাকে না যার থেকে বাবাকে কিছু-কিছু পাঠাতে পারে। এবার ভালো একটা চাকরি পেলে তাঁদের নিয়ে এসে বাসা ভাড়া ক'রে থাকবে, সেই বেশ হবে। …অথচ এসব দুঃখ-কষ্টের এখুনি শেষ হয় যদি ও যতীনবাবুর সেই উন্মাদিনী মেয়েটিকে বিয়ে করে। কিন্তু না। যাকে অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী

করতে হবে, সুখে-দুঃখে জীবনের সহচারিণী রূপে যার সঙ্গে বসবাস করতে হবে—পরমাত্মীয়া ভেবে তাকে ভালোবাসতে না পেরে শুধু বড়লোক হবার লোভে তার সঙ্গে ছলনা করতে পারবে না। তার চেয়ে ভিটে যায় যাক্, কি আর করা যাবে।···

"শুনছো ? এদিকে এসো।"

দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দেয় সেই যুবকটি।

সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে সুব্রত।

যুবকটি ফিরেছে, ওকে যেতে বলছে তার সঙ্গে।

সুব্রত উঠলো। উঠে গাড়ীবারান্দার নীচে যেতেই সে সিঁড়িটা দেখিয়ে তার অনুসরণ করবার ইঙ্গিত ক'রে আগে-আগে উঠতে লাগলো, সুব্রত সিঁড়ির নীচে একপাশে ওর জলে-ভেজা 'বাটা'র চটিটা রেখে তার পেছনে-পেছনে উঠে সেই নির্জ্জন ঘরে ঢুকে চুপ ক'রে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলো।

উত্তর-দক্ষিণে লম্বা সুসজ্জিত হলঘর। মার্ব্বেল-পাথরের মেঝের মাঝখানে পাতা কার্পেটের চারপাশে কায়দামাফিক সাজানো কুশন সোফা কৌচ, জানলার মাঝের অল্প-পরিসর দেয়ালে ঝালর-দেয়া ব্রাকেট-আয়না; আমেরিকান্ ওক্‌কাঠের এম্বজড্ ফ্রেমে-আঁটা ব্রোমাইড্-কলারিং ফোটো, পোর্ট্রেট, বড় দেয়ালে বড়-বড় অয়েলপেন্টিং—পাশ্চাত্যের অনুকরণে সাহেব-উপাধিধারী শিক্ষিত ধনীদের কেতাদুরস্ত সাজানো ঘর যেমন হয়ে থাকে।

চিরবান্ধবী

সেই হলঘরের দু-দিকের দুটি দরজার পরদার আড়ালে দু-খানি ঘরের রহস্য যা এখনো অজ্ঞাত আছে সুব্রতর, সেইটে জানবার আগ্রহে ও সেদিকে চেয়ে আছে এমন সময় যুবকটি একটু হেসে বললে, "বাইচান্স এসে পড়েছো হে! গুড্ লাক্ বলতে হবে তোমার। অভিমান ক'রে ফিরে যাচ্ছিলে সাহেব বাড়ীতে নেই শুনে, কিন্তু ছাখো, আমি রুখলাম বলেই চাকরিটা আজই পেয়ে যাবে দিদিমণির কাছ থেকে, কিন্তু— 'বাই-দি-বাই', একটা কথা তোমায় আগে থেকেই জানিয়ে রাখছি, আমার নামটা হচ্ছে এম. রয়। বাঙলায় মতিলাল রায়। তা হোক্। তুমি কিন্তু আমায় এখন থেকে আর 'বাবু' ব'লে না ডেকে 'মিঃ রয়' বলেই ডাকবে—ভুলো না।···

আচ্ছা এবার কাজের কথা হোক্, এখুনি দিদিমণি এসে পড়বেন এ-ঘরে। তাঁর এক বন্ধু এসেছেন আজ···গান হচ্ছিলো পাশের ঘরে শোনোনি এতক্ষণ? দিদিমণির মতো গান এ-তল্লাটে কেউ গাইতে পারে না এ-কথা সবাই জানে। কিন্তু তোমার ওসব না জানলেও চলবে। তুমি কি-কি রাঁধতে জানো এখন সেইটেই আগে জানা দরকার আমার। বাংলা-খানা ডাল-সুক্তনি-উচ্ছেচচ্চড়ি এখানে চলবে না। এই ধরো—চপ্ কাটলেট্ ওম্‌লেট্ স্যাণ্ডউইচ্ ডেভিল মটন্-চপ্ টোস্ট রোস্ট ফাউলকারি দোপেঁয়াজি সামি-কাবাব···এমনিতরো সাহেবী-খানা আর-কি। অন্য জায়গার সার্টিফিকেট থাকে ভালো, না থাকলেও ক্ষতি নেই, একদিন তোমার হাতের

রান্না 'টেষ্ট' করলেই বাহাত্বরী ধরা পড়বে, সে-কথা নয়, কথাটা হচ্ছে ঐ একটু আগে যা বললাম—'মতিবাবু' নয়, আমায় ডাকবে 'মিঃ রয়' ব'লে—বুঝলে ?"

হাসি সামলাবার জন্যে চাপা-কাসি কেসে দু-বার ঢোঁক গিলে সুব্রত ঘাড় নেড়ে সায় দিলে—হ্যা, তাই বলবে। মনে মনে ভাবলে, লোকটা বলে কি ? শেষপর্য্যন্ত ছোকরা কি ওকে বাবুর্চী ঠাউরেছে নাকি ?

বিস্মিত-চোখে ও চেয়ে থাকে মতিলালের মুখের দিকে।

মতিলাল গম্ভীরমুখে ব'লে চলে—"এঁদের পুরোনো বাবুর্চীটা আজ তিনদিন হলো ছুটি নিয়ে দেশে গেছে, যে লোকটিকে তার জায়গায় দিয়ে গেছে সে একদিন কাজ করেই পালিয়েছে তাই সাহেব তোমায় আসতে বলেছেন বাড়ীতে। পুরো সাহেবমানুষ তো। ডাল-ভাত-চচ্চড়ি খাওয়া অভ্যেস না থাকলেও বাধ্য হয়ে ওইসব অখাদ্য খেতে হচ্ছে তাঁকে, আর ভীষণ কষ্ট সহ্য ক'রে রাঁধতে হচ্ছে দিদিমণিকে—"

"কি সব বকছো বক্‌বক্ ক'রে, মতি ?" বলতে-বলতে পাশের ঘরের পরদা সরিয়ে যিনি এসে দাঁড়ালেন, সেদিকে না চেয়ে লজ্জিত-সঙ্কোচে সুব্রত তাকালে নিজের কাদা-মাখা খালি পায়ের দিকে।

তাড়াতাড়ি উঠে তাঁর সামনে গিয়ে মতিলাল বললে,

"আজ্ঞে, বক্‌বক্ নয়, সেই লোকটির সঙ্গে কথা কইছিলাম, সাহেব যাকে—"

আর-একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "অর্থাৎ সাহেব যাকে রাঁধতে পাঠিয়েছেন! ...চমৎকার শুভ্রজা। 'কুক্' হিসেবে লোকটি ভালোই হবে মনে হচ্ছে।"

এতক্ষণে মুখ তোলে সুব্রত।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুটি তরুণী। গ্রীণ টিউব-লাইটের চোখ-ঝলসানো তীব্র সবুজ আলো সেই দুটি মুখের ওপর প'ড়ে কল্পলোকের ভ্রান্তি এনে দেয় সুব্রতর চোখে। একবার চেয়েই দৃষ্টি নত করে ও।

এবার বোধকরি প্রথম তরুণীটি ব'লে ওঠেন, "তুমি থামো তো প্যামেলা, ছেলেমানুষী তোমার এখনো গেল না দেখছি। ব'লে দেবো মিঃ রায়কে আর মিস্ সিম্‌সনকে, এরপর তোমায় যেন সংযতবাক্ হওয়ার শিক্ষা দেন তাঁরা।"

সুমিষ্ট খিল্‌খিল্ হাসির তরঙ্গে সারা ঘরখানাকে উদ্বেল ক'রে তুলে মেয়েটি বললে, "সেই ভালো শু, তুমি বরং মেমসাহেবকেই জানিও, কারণ মিঃ রায়ের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়, আর পেলেও কোনো কাজ হবে না—আচ্ছা গুড্‌বাই...ঘড়িতে ঐ আটটা বাজ্‌ছে...আর দেরী করলে মেমসাহেব কৈফিয়ত তলব করবেন...চলি ভাই।"

হিল্-তোলা জুতোয় হাল্‌কা শব্দ তুলে পাশ দিয়ে বেরিয়ে

যায় তরুণী প্যামেলা। সঙ্গে যায় মতিলাল, ওকে মোটরে তুলে দিয়ে আসতে হবে।

চোখ তুলে তাকে একবার দেখে নেয় সুব্রত—গাউন-পরা একটি মেয়ে…বব্‌ড্‌ চুল…চোখে এসময় অনাবশ্যক গগ্‌লস্‌ আঁটা তাই মুখটা তার স্পষ্ট দেখা গেল না।

এতক্ষণ পরে শুভ্রজা ঘরে ঢুকে টেবলের পাশের চেয়ারখানা টেনে নিয়ে ব'সে বললে, "ওদের কথায় তুমি কিছু মনে কোরো না বাপু, মতি মনে হয় তোমাকে অনেক-কিছুই বলেছে, বেশী বকা ওর স্বভাব, আর প্যামেলা—ওর কথাও বাদ দাও, আমি তোমার মুখে শুনতে চাই, সত্যিই কি তুমি এ-বাড়ীতে কাজ করতে এসেছো?"

সুব্রত মুখ তুললে। তুলে যা দেখলে তা কিছুক্ষণ আগের ওর কল্পনার সঙ্গে হুবহু মেলে। উদ্ভিন্নযৌবনা অপূর্ব্ব সুন্দরী একটি মেয়ে। সেই মুখ। হারানো-অতীতের এক বিহ্বল-মুহূর্ত্তে একে ও দেখেছিল—এরই মধুমাখা কণ্ঠে খানিক আগে-শোনা গানটি শুনেছিল একদিন কলেজের হলে। শুভ্রজা এর নাম। হ্যাঁ, শুভ্রজাই বটে। এ যেন জীবন্ত সরস্বতী। …উজ্জ্বল শুভ্র গায়ের রঙ্, হরিণীর মত আয়ত দুটি চোখ, আর ভ্রূ যেন তুলি দিয়ে আঁকা। শুভ্র ছোট কপালখানির ওপর মাথার কোঁকড়ানো কালো চুল থেকে দলচ্যুত হয়ে প'ড়ে দু-চারটে চূর্ণ চুল পাক খেয়ে ফিরে যেতে চাইছে

যেন স্বস্থানে আবার অলকদামে।···পরনে সরু পাড় শুভ্র ধুতি···গায়ে শুভ্র একটি ব্লাউজ ওর গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে আছে···কালো ইটালিয়ান মার্ব্বেল-পাথরের মেঝেয় ওর পাদুকা-শূন্য পা দু'খানিকে শুভ্র শতদলের সঙ্গেই তুলনা করা চলে।

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অবাক্‌বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে সে-কথা চাপা দিয়ে শুভ্রজা অন্য কথা পাড়লে, বললে, "শুনলাম, বাবা তোমায় আজ আসতে বলেছেন, অথচ তাঁর খেয়াল নেই আর আমাকে বা আমাদের সরকার ঐ মতিলালকেও জানাননি সে-কথা। যাই হোক্, বাবুর্চীর কাজের জন্যেই যে তোমায় আসতে বলেছেন তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সাহেবী-খানা তৈরী করবার তোমার অভ্যেস আছে তো? কি-কি রাঁধতে জানো তুমি?"

মৃদুকণ্ঠে সুব্রত বললে, "কিন্তু আগেই আপনাকে জানাচ্ছি যে, আমি বাবুর্চীর কাজ করতে আসিনি—রান্নার কাজ কিছুই জানি না আমি। কেউ রেঁধে দিলে খেয়ে ভালো-মন্দ'র বিচার করতে পারি, কি ক'রে রাঁধতে হয় তা আজপর্য্যন্ত কেউ শেখায়নি আমাকে।"

প্যামেলাকে মোটরে তুলে দিয়ে এসে ঘরে ঢোকবার সময় সুব্রতর এই কথা শুনতে পেয়ে মতিলাল জোরগলায় ব'লে উঠলো, "সে কি? তবে যে আমাকে বললে, তুমি রাঁধতে পারো?"

সুব্রত প্রতিবাদ করে, "না, ও-কথা আমি মোটেই বলিনি। আপনি ভালো ক'রে মনে ক'রে দেখুন, মিঃ রয়।"

"মিঃ রয়"—

সকৌতুকে শুভ্রজা তাকায় মতিলালের মুখের দিকে, তারপর ওর স্বভাবসিদ্ধ স্মিত-হাসি হেসে সুব্রতর দিকে চোখ ফিরিয়ে বলে, "তোমায় দেখেই তা বুঝেছি আমি—মানুষ দেখে বোঝবার ক্ষমতা আমার আছে, আর প্যামেলাও তাই বুঝে সে-কথা নিয়ে বিদ্রূপ করেছিল। তার জন্যে কিছু মনে কোরো না, বাবুর্চী হঠাৎ চলে যাওয়ায় আমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে কিনা, তাই তুমি চাকরি চাইতে আসায়, বাবুর্চীর কথাটাই মনে হয়েছে আমাদের। যাক্, বাবা যখন তোমায় আসতে বলেছেন তখন তাঁর সঙ্গেই কথা বোলো—কেমন?"

সুব্রত মুখ তোলে—দ্বিধাহীনকণ্ঠে স্পষ্ট বলে, "কিন্তু সবিনয়ে আপনাকে জানাচ্ছি যে, আমি মিথ্যে কথা বলিছি।"

"মিথ্যে কথা বলেছো?" বলেই দারুণ আতঙ্কে শিউরে উঠলো শুভ্রজা। বাড়ীতে গৃহস্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে যারা ডাকাতি করে এ-লোকটা সেই দলের কিনা তাই-বা কে জানে! ওই শালপ্রাংশু চেহারা···মূর্ত্তিমান্ বিভীষিকার মত একমুখ গোঁফদাড়ি···এইরকম ছদ্মবেশী বহুরূপী ডাকাতদের কথা তো প্রায়ই খবরের কাগজে পড়েছে ও। কিন্তু এর সামনে এখন বেশী উতলা হওয়া ঠিক নয়···

যত রাগ গিয়ে পড়লো ওর মতিলালের ওপর, বললে,

"ভালো ক'রে সন্ধান না নিয়ে তুমি একজন অপরিচিত লোককে একেবারে ওপরে তুলে আনলে কেন! বাবা এসে শুনলে তোমার কি অবস্থা হবে জানো?"

সেই কথাটাই মনে-মনে ভাবছিল মতিলাল, এবার ঠিক ব্যথার জায়গায় আঘাত পড়তেই সুব্রতর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি হেনে ক্ষিপ্তের মত চীৎকার ক'রে উঠলো, "ড্যাম্ লায়ার! তুমি বলোনি আমায় যে, সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছে··· কথাবার্ত্তা চলেছে আর তিনি তোমায় আসতে বলেছেন বাড়ীতে? কোন্ কথাটা সত্যি তোমার? ·· ইচ্ছে করছে— এমন ইচ্ছে করছে যে, একটি ঘুষিতে তোমার নাকটা—"

আবার একটা নতুন অনর্থের আশঙ্কায় বুদ্ধিমতী শুভ্রজা মতিলালকে থামিয়ে দিয়ে সুব্রতর দিকে ফিরে সংযতকণ্ঠে বললে, "যাক্, যা হবার হয়েছে। এসে যখন পড়েছো তখন শুনে যাও, সাহেব বাড়ীতে কারুর সঙ্গে দেখা করেন না, আর কোনোরকম গোলমালও পছন্দ করেন না—অফিস তাঁর অফিস, বাড়ী তাঁর বাড়ী। কোনোটার সঙ্গেই কোনোটার সংস্রব রাখতে চান না তিনি। তিনি যে চাকরি দেবেন ব'লে তোমায় বাড়ীতে আসতে বলেছেন এ-কথা আমি মোটেই বিশ্বাস করতে পারছিনে। কিন্তু আমার প্রথম প্রশ্ন—তুমি কি ক'রে ঢুকলে এ-বাড়ীতে?"

আমৃতা-আমৃতা ক'রে সুব্রত বললে, "কোনো বৈধ-উপায়ে নয়।"

এবার সত্যিই স্বেদাক্ত হয়ে উঠলো শুভ্রজার শুভ্র ললাট—"কি বললে ?"

বেশ সহৃদয়তার সঙ্গেই সুব্রত বললে, "বললুম খাঁটি সত্য কথা। কিন্তু যেভাবেই ঢুকে থাকি তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। কারণ আমি একজন অভাবগ্রস্ত বেকার ভদ্রসন্তান ছাড়া, চোর-ডাকাত নই। তবে আমি স্বীকার করছি যে, চোর-ডাকাত না হলেও, অনিচ্ছাসত্ত্বেই আমায় চোরের মতন ঢুকতে হয়েছে আপনাদের বাড়ীতে এবং এই সত্য স্বীকার করার পর এখন ইচ্ছে হ'লে আপনারা যে-কোনো শাস্তি দিতে পারেন আমায়, তাতে—"

লুপ্ত সাহস ফিরে আসে মতিলালের। এগিয়ে এসে মুষ্টিবদ্ধ হাতখানা সুব্রতর নাকের সামনে তুলে ধ'রে সগর্জ্জনে ব'লে ওঠে—"শাস্তি ? হ্যাঁ-হ্যাঁ, দেবোই তো। ভীষণ শাস্তি দেবো···পুলিস ডাকবো···ধরুন দিদিমণি রিসিভার···ফোন্ করুন থানায়···তার আগেই ওকে পিছমোড়া ক'রে বাঁধতে হবে—এই রামশরণ ? ···নেহাল সিং ? ···হরিচরণ ?··· সুন্দরলাল ? ···মিশির সিং ? আরে, জল্‌দি সব্ লোগ্ উপরমে আ-যাও, ডাকু পাকাড় গিয়া"···ব'লে এমন পরিত্রাহী চীৎকার সুরু ক'রে দিলে যে, ওকে নিষেধ করবার অবসরটুকুও পেলে না শুভ্রজা।

আর যায় কোথায় ? বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে···সাহেব

বাড়ী নেই···দিদিমণি একলা···হোক্ পাতলা-লোক রায়বাবু, পাক্‌ড়েছে যে ডাকাতকে এই না কত তাঁর বাহাদুরী।···

হৈ-হৈ করতে-করতে যে যেখানে ছিল চাকর দরোয়ান ড্রাইভার বাবু সব হাতের কাছে যে যা পেলে, লাঠি-সোঁটা ডাণ্ডা নিয়ে ছুটতে-ছুটতে ওপরে উঠে গিয়ে দোতলাটা একেবারে সরগরম ক'রে তুললে।

ওদের দেখেই মতিলাল ব'লে উঠলো, "গোঁফদাড়িওয়ালা এই আদ্‌মি···এ ডাকু যব্ ফটকমে ঘুসা তব্ তোম্‌লোগ্ কাঁহা থা? কৈ দেখা হ্যায় ইস্‌কো?"

যে যার ভাষায় সবাই একবাক্যে জানালে, না, তারা গ্যাখেনি কেউ একে ফটক দিয়ে ঢুকতে।

মতিলাল বললে, "শুনলেন তো দিদিমণি? নিশ্চয় পাঁচিল টপ্‌কে ঢুকেছে ও। ডাকুন ফোনে থানার লোককে, আর দেরী করবেন না। ···এই? তোম্‌লোগ্ খাড়া হোকে দেখ্‌তা কেয়া? পাক্‌ড়ো ইস্‌কো—"

সুব্রত হাত তোলে—"থামুন মশাই, আপনার সঙ্গে আমি কথা কইছি না, কথা হচ্ছে এঁর সঙ্গে। ইনি কি বলেন শুনুন আগে তারপর হুকুম চালাবেন।"

পেট্রোলে হঠাৎ আগুন লাগার মত জ্বলে উঠে মতিলাল বললে, "উনি ভদ্রমহিলা, ডাকাতের পক্ষ নিয়ে উনি কথা কইবেন কি? একলা-বাড়ীতে হঠাৎ ডাকাত পড়লে কি করতে হবে, বাড়ীর মালিক সাহেব নিজে সে হুকুম আমায়

দিয়ে রেখেছেন···আচ্ছা, আসছি আমি···হুঁসিয়ার রহো সব লোগ্" ব'লে বাঁ-দিকের ঘরের পরদা সরিয়ে হঠাৎ কোথায় চলে গেল কে জানে।

শুভ্রজার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু-চোখে তাকিয়ে সুব্রত বললে, "তারপর? এবার আমি যেতে পারি কি?"

লাল হয়ে ওঠে শুভ্রজার মুখ, বলে, "তার আগে আমায় জানতে হবে যে তুমি ডাকাত নও, আর আমাকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত বুঝে তুমি গিয়ে তোমার পেছনের দল পাঠিয়ে আমায় বিপন্ন করবে না।"

ম্লান হেসে সুব্রত বললে, "এখনো জানতে বাকি আছে? আপনাদের সরকার ঐ মতি রায় আমায় নিখুঁত ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখেছে যে আমি সম্পূর্ণ রিক্ত···কোনো দুরভিসন্ধি কাজে পরিণত করার মতন কোনো অস্ত্রই নেই আমার কাছে, তবুও যদি না বিশ্বাস করেন তো আপনিও দেখুন" ব'লে দরোয়ান-চাকরের হাতে অপদস্থ হবার আশঙ্কায় অজ্ঞানের মত সহসা এমন একটা অবাঞ্ছিত কাজ ক'রে ফেললে যে, কোনো অপরিচিতা পুরমহিলার সামনে সেরকম করা একেবারে ভদ্রতার আইনের বাইরে।···

সুব্রত ওর জলে-ভেজা পাঞ্জাবীটার ঝুলের তলা ধ'রে বুক পর্য্যন্ত তুলেই আবার নামিয়ে দিয়ে প্রমাণ করলে যে, শুধু কাপড়-জামা ছাড়া সত্যিই একটা আলপিন পর্য্যন্ত নেই ওর কাছে।

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো শুভ্রজার শুভ্র নত মুখ। সুব্রতর বিনয়নম্র কথা আর ধবধবে ফর্সা চওড়া খালি বুকের কিছুটা অংশ দেখেই এই মুহূর্ত্তে ওর বুঝতে বাকি রইলো না যে, সত্যি, আর যাই হোক্‌, বেকার ভদ্রসন্তান ছাড়া, ডাকাতির কোনো লক্ষণ বা ছাপ নেই ওর মুখে কিংবা চেহারায়। তাই মাথা তুলে ভৃত্যদের আদেশ করলে সেখান থেকে চলে যেতে—প্রয়োজন হ'লে ডাকবে, এখন যে-যার কাজে চলে যাও···

সবাই চলে গেল।

কদম্বকেশরের মত রোমাঞ্চ-গায়ে শুভ্রজা জিগেস করলে, "তুমি কে? দেখে মনে হচ্ছে তুমি বেকার হলেও ভদ্র। তাছাড়া অশিক্ষিত নয়। তোমার সত্য পরিচয় দাও।"

"নিশ্চয় দেবো, মিস্ সেন। চোরের মত ঢুকলেও, সাধুর প্রশংসা নিয়েই বেরিয়ে যেতে পারবো মনে হচ্ছে। তার আগে আমার দুটি অনুরোধ আছে। একটি হচ্ছে, আমি যখন পরিচয় দেবো তখন 'মিঃ রয়' এ-ঘরে থাকবে না, আর দ্বিতীয়টি—ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন, আপনার কি ডায়েরী লেখার অভ্যেস আছে?"

শুভ্রজা বললে, "তা আর থাকবে না কেন, কিন্তু তাতে তোমার কি?"

"আমার? আমার প্রকৃত পরিচয় লেখা আছে আপনার সেই ডায়েরীতেই। শুনুন, এটা হচ্ছে ৫৬ সাল। দয়া ক'রে

আপনি ১৯৫১ সালের ডায়েরীটা আনুন, আমি ততক্ষণ হিসেব ক'রে ঠিক তারিখটা বের করি।" ব'লে টেবলের ওপর যে লেটার-প্যাডটা পড়েছিল সেইটে টেনে নিয়ে সুব্রত বললে, "একটা পেন্সিল বা কলম যদি দেন—ও, ঐ তো টেবলেই রয়েছে, আচ্ছা যান আপনি।"

শুভ্রজা বুঝতে পারে না লোকটিকে। ডাকাত না হতে পারে, কিন্তু 'ম্যাজিসিয়ান' হতে পারে তো? না, তারই-বা কি দরকার অকারণে আমাকে ভয় দেখাতে আসবার···

অবাক হয়ে শুভ্রজা ভাবছে এমন সময় অবাক কাণ্ড—বাঁ-হাতে একটা বন্দুক আর ডান হাতে একটা চক্চকে অটোমেটিক রিভলভার নিয়ে চীৎকার করতে-করতে ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে মতিলাল দেখলে, তার আজ্ঞাবহ রক্ষীরা সবাই ঘর ছেড়ে চলে গেছে। তবুও সে নিরুৎসাহ হলো না, বললে, "এই নিন্ দিদিমণি, রিভলভার। আর বন্দুকটা থাক্ আমার কাছে। কিন্তু আপনাকে একা রেখে এরা সব গেল কোথায়?"

শুভ্রজা বললে, "এসব কি? 'গান্-সেফ'-এর চাবি তুমি পেলে কোথায়?"

মতিলাল বললে, "বিপদের সময় ব্যবহারের জন্যে সাহেব আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন কোথায় কি থাকে। কিন্তু গেল কোথায় সব তারা?"

"তাদের আমি চলে যেতে বলেছি। তোমারও আর

এখানে থাকবার দরকার নেই। রিভলভারটা আমায় দাও, আর তুমি বন্দুক নিয়ে পেছনের খিড়কির ফটকে পাহারা দাওগে, ডাকাতরা যদি আসে তো সেইদিক দিয়েই আসবে। যাও, আর দেরী কোরো না।" আদেশের সুরে এই কথা বলতেই মতিলাল বললে, "আপনাকে একলা ফেলে?"

শুভ্রজা বললে, "কোনো ভয় নেই। সামনে টেলিফোন আছে, আমার হাতে রিভলভার রইলো, তাছাড়া বাইরে সশস্ত্র তোমরা রইলে, তা সত্ত্বেও যদি ডাকাতরা কোনো দিক দিয়ে এসে পড়ে, তাদের দলের লোক তো এই সামনেই ব'সে। এর এতটুকু দয়া আছে যে, অন্তত মা-বোনের জাতকে প্রাণে মারবে না।"

যেন নিভে গিয়ে মতিলাল বললে, "কি বলছেন দিদিমণি? এই নাছোড়বান্দা ছ্যাঁচড়া ডাকাতটাকে বিশ্বাস ক'রে আপনি আমায় বলছেন বাইরে চলে যেতে?"

"তাছাড়া এখন আর কি বলবো। বাঙালী-মেয়ে হয়ে প্রাণের ভয়ে এই নির্ভীক বাঙালী-যুবককে যদি বিশ্বাস না করি, বোন্ যদি তার ভাইকে বিশ্বাস না করে, মা যদি তাঁর ছেলের ওপর বিশ্বাস হারায়···যাক্, তোমায় যা বলছি শোনো, পেছনের গেটে গিয়ে পাহারা দাওগে। যাও?"

"লোকটা নিশ্চয়ই যাদুকর—মিস্‌মেরিজম জানা আছে ওর" মনে করতে-করতে বিমর্ষ মতিলাল বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। সুব্রতকে বলে শুভ্রজা, "তোমাকে বিশ্বাস ক'রে

দারুণ দুঃসাহসের কাজ করলেম, দেখলে তো? যাক্, প্রথম অনুরোধটা তোমার মিটলো, এবার ডায়েরী চাই—না? আচ্ছা বোসো একটু···আনছি আমি তোমার জন্যে আমার লেখা ডায়েরী—কত সালের বললে?"

সুব্রত বললে, "১৯৫১'র।"

শুভ্রজা উঠে পাশের ঘরের দিকে চলে যায় দেখে সুব্রত ব'লে উঠলো, "যাবেন না, যাবেন না! আততায়ীর হাতের কাছে মারণাস্ত্র ফেলে রেখে যাবেন না, আপনার রিভলভারটা তুলে নিয়ে যান টেবল থেকে।"

সন্দেহের যেটুকু বাকি ছিল তা শেষ হয়ে গেল সুব্রতর মুখে এ-কথা শুনে। ছি ছি, এই মানুষকে এতক্ষণ ধরে কি নাস্তানাবুদই না করেছে ওরা। ফিরলো শুভ্রজা। ফিরে বললে, "তুমি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ তা বুঝেছি, এবার তোমার ঠিকানা আর নামটা রেখে যাও, বাবা এলে তাঁর সঙ্গে কথা ক'য়ে তোমায় খবর দেবো।"

হাতজোড় ক'রে শুভ্রজাকে নমস্কার জানিয়ে সুব্রত বললে, "ধন্যবাদ—অনেক-অনেক ধন্যবাদ আপনার এই দয়ায় জন্যে। এরপর কাজ পাই আর না পাই, আপনার এই উদার ব্যবহার চিরদিন আমার স্মরণ থাকবে।"

রিভলভারটা টেবল থেকে তুলে হাতে নিয়ে শুভ্রজা ডায়েরী আনতে যাবার সময় পাঁচ বছর আগের এমন কোনো মানুষকে ওর মনের গহন হাতড়ে আবিষ্কার করতে পারলে না

যার সঙ্গে এই নবোদ্ভিন্ন কচিঘাসের মত গোঁফদাড়ি-ভালো মুখের লোকটির চেহারা মেলে। খানিক পরেই ডায়েরী হাতে নিয়ে ফিরে এসে শুভ্রজা দেখলে, ঘর শূন্য। তার অনুপস্থিতির ফাঁকে যাদুকর কখন বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে—রেখে গেছে টেবলের ওপর একখানা কাগজে বড়-বড় অক্ষরে লিখে শুধু তার স্মৃতি···

লুব্ধ দৃষ্টিতে মন্ত্রমুগ্ধার মত শুভ্রজা পড়লে :

'একদা-পরিচিত আপনার কলেজ-বন্ধু

শ্রীসুব্রত মিত্র'

বেতসলতার মত কাঁপতে-কাঁপতে চেয়ারে ব'সে প'ড়ে শুভ্রজা দেয়ালে-ঝোলানো একখানা 'বাষ্ট ফোটো'র সঙ্গে সুব্রতর মুখের তুলনা করেই আপন মনে ব'লে উঠলো—"না না, না···"

*

* *

পটলডাঙ্গার এক অখ্যাতনামা মেস 'রাজবাড়ী-বোর্ডিং'-এর বোর্ডার আমাদের সুব্রত মিত্র।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর অল্প খরচে থাকবার মত এই হোটেলটি যা দেখে ও আবিষ্কার করেছিল সে এক বিস্ময়ের ব্যাপার! পাইস-হোটেলে বা পান্থনিবাসের প্রবেশ-দ্বারের

দারুণ যেসব খাদ্যতালিকার নাম-দামের ফিরিস্তি ঝোলানো থাকে বোর্ডে, নিজের আর্থিক অবস্থার সঙ্গে তুলনা ক'রে সেখানে ওর প্রবেশাধিকার নেই জেনে সেদিন বিকেলে পরিশ্রান্ত হয়ে বড়বাজারের ধর্ম্মশালার দিকে যখন ফিরছে, সেই সময় পটলডাঙ্গার এক গলির মোড়ে দেখলে, একটা জীর্ণ একতলা বাড়ীর নীচু-দরজার মাথায় মলাটে-আঁটা খবরের কাগজের ওপর লালকালিতে মোটা-মোটা অক্ষরে লেখা বিজ্ঞপ্তি ঝুলছে :

"রাজবাড়ী বোর্ডিং"

—এখানে কম খরচে ভেজাল-বর্জ্জিত আহার্য্য ও
বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত আছে—

উপরন্তু দরজার পাশে আলকাতরা-মাখানো কাঠের বোর্ডে খড়ি দিয়ে লেখা খাদ্যতালিকার লোভনীয় নাম ও বাঞ্ছনীয় দাম দেখে ও থম্‌কে থামলো আর সবচেয়ে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে নীচেকার লাইনের

'চিপিটক—/০ আনা ডিস্'

লেখা বড়-বড় অক্ষরগুলো। হ্যাঁ, হোটেলের কর্ত্তাদের বুদ্ধি আছে। দরকারে-অদরকারে ঢের-ঢের মেস-হোটেল-বোর্ডিংএ যাতায়াত করতে হয়েছে ওকে, কিন্তু 'চিপিটক'-এর বিজ্ঞাপন কোনো রেষ্টুরেণ্টেই ও ছ্যাখেনি কখনো। না দেখলেও, আশ্রিত মেম্বরদের স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি বৃদ্ধির অনুকূলে সস্তায় চিপিটক অর্থে 'চিঁড়ে' কিছু কম ভিটামিন্‌যুক্ত আহার্য্য নয়। তাছাড়া

এ-বোর্ডিংয়ের 'ভেজাল-বর্জ্জিত' বিজ্ঞাপনটা ওর ভারি ভালো লাগলো।

বর্ত্তমানে আমাদের স্বাধীন দেশে একডাকে-চেনা কতকগুলি নির্ভরযোগ্য সম্ভ্রান্ত হোটেল-রেঁস্তোরা-বোর্ডিং-আশ্রমে খাঁটি জিনিসে তৈরী খাবার পাওয়া যায় এ-কথা ঠিক, তবে অবস্থার ফেরে সকলের হয়তো সেখানে যাওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু ভেজাল পচা বাসি ও সংক্রামক রোগীদের খাওয়া-পাত্র বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পরিষ্কার না ক'রে শুধু 'ন্যাতা' বুলিয়ে তাতেই মাছ-মাংস খেতে দিয়ে নিজের দেশবাসীদের দুর্ব্বল ব্যাধিগ্রস্ত ক'রে তোলার দুষ্প্রবৃত্তি ছিল যাদের, গভর্ণমেণ্টের খাদ্যসচীবের কড়া শাসন ও নিখুঁত তত্ত্বাবধানের ফলে তারা পালিয়ে পগার পার হলেও ছিটে-ফোঁটা দু'একটা যা প'ড়ে আছে এখনো, তাদের থেকে সাবধান হবার জন্যে যদি সামর্থ্যে কুলোয় তো এই বোর্ডিংয়েই থাকবে ও।

সুব্রত ঢুকলো 'রাজবাড়ী-বোর্ডিং-এর ভেতরে এবং রুম-মেট বিমানবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে জানালে ওর বর্ত্তমান অবস্থার সত্য ভাষণ—চাকরির জন্যে কলকাতায় এসে অনেক কষ্টের পর ভালো একটা চাকরি পাবার আশা হয়েছে এবার, বর্ত্তমানে তিনটে টিউসানির আয় থেকেই ওকে চালাতে হবে এবং প্রতি মাসকাবারে বেতন পেলেই ও আগে এই বোর্ডিংয়ের বিল মিটিয়ে দিতে পারবে, এখন ম্যানেজারবাবু যদি দয়া ক'রে এই সার্টিফিকেটগুলো নিজের জিম্মায় রেখে যে-কোনোরকম একটু

স্থান দেন ওকে, সে অনুগ্রহের কথা ও জীবনে ভুলবে না, ইত্যাদি।

সুন্দর চেহারার জয় সর্ব্বত্র।

রাজপুত্রের মত সুব্রতর সুদর্শন সৌম্যমূর্ত্তি আর 'স্কুল-ফাইনাল' থেকে সুরু ক'রে 'বি-কম' পরীক্ষায় ইউনিভার্সিটির শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করার নজীরগুলি দেখে ম্যানেজারবাবুর মায়া হলো বোধকরি ওর ওপর, বললেন, "বেশ তো, টিউসানির বেতন নিশ্চয় ইংরেজী মাসকাবারে পাবেন, তা, নভেম্বর শেষ হতে তো আর মাত্র পাঁচদিন বাকি। তাই হবে, বেতন পেলেই দেবেন আমাদের বিল মিটিয়ে এ-ক'দিনের। কিন্তু আপনাকে 'সিট্' দিই কোথায়?" ব'লে ভাবলেন, ওপাশের ঐ কোণের ঘরটায় যে চারটে সিট্ আছে তার মধ্যে বনোয়ারীলাল দেশে গিয়ে আজও ফেরেনি, মণীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে এখন হাঁস-পাতালে আছে, থাকবার মধ্যে আছেন এক অবলাবাবু, বাকি একটা সিট্ খালি আছে বটে···ভেবে নিয়ে বললেন, "বিপন্ন হয়ে যখন এসে পড়েছেন আমাদের বোর্ডিংয়ে তখন কি আর করা যাবে—চলুন, আপনাকে সিটটা দেখিয়ে আর সব কথা খুলে ব'লে অবলাবাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসি।"

সুব্রত যেন নবজীবন ফিরিয়ে পেলে ম্যানেজারবাবুর এই আশ্বাসবাণীতে, তারপর ওঁর সঙ্গে সেই ঘরে গিয়ে অবলাবাবুর সঙ্গে পরিচিত হবার পর তাঁকে বললে, "আজ থেকে আপনার একান্নবর্ত্তী গোষ্ঠী হলুম দাছু, দায়ে-অদায়ে একটু দেখবেন দয়া

ক'রে, এখন একটু পায়ের ধূলো দিন" ব'লে প্রথম দর্শনেই মিষ্টি-কথাবার্ত্তায় তাঁকে এমন মুগ্ধ ক'রে ফেললে যে, আনন্দে প্রবীণ ভদ্রলোকটির চোখের কোলে জল এসে গেল।

ম্যানেজারবাবু বললেন, "আচ্ছা, আপনারা এখন আলাপ-আলোচনা করুন, আমি অফিস-ঘরে আছি, দরকার হ'লে আমায় খবর দেবেন।"

বিমানবাবু চলে যাবার পর অবলাবাবু বললেন, "এবার তাহলে এক গেলাস চা আনিয়ে দিই! আহা, মুখখানি শুকিয়ে একেবারে আম্‌সি হয়ে গেছে।"

সুব্রত বললে, "এখন থাক্ দাদু, ওদিকে ধর্ম্মশালায় আমার সুটকেশ, বালিশ আর কম্বলটা প'ড়ে আছে, সেগুলো নিয়ে এসে চা খাবো। জানেন তো, ধর্ম্মশালা পাঁচ-ভূতের কাণ্ড, আর আমার সম্বল শুধু সেই বালিশ আর কম্বল। আগে নিয়ে আসি সেগুলো সেখান থেকে।"

অবলাবাবু বললেন, "তা তো যেতেই হবে। কিন্তু আনবে কি ক'রে ব'য়ে তোমার সেই সম্পত্তিগুলো? তার জন্যে রিক্সো কিম্বা একটা কুলীও চাই তো। ম্যানেজারের সঙ্গে এখানে কথা বলার ফাঁকে তোমার সব কেচ্ছাই যে বেফাঁস হয়ে গেছে। বাইরে বাবু হলেও ভেতরে যে তুমি একটি আস্ত নাগা-সন্ন্যাসী তা আমি জেনে ফেলেছি ভায়া—রোসো—রোসো। অপেক্ষা করো একটু।"

বালিশের তলা থেকে হাতে-বোনা একটা গেঁজে বের

ক'রে তার মধ্যে থেকে বেছে-বেছে একটা আধুলি নিয়ে বললেন, "এটা কিন্তু আমি হাওলাত দিচ্ছি মনে থাকে যেন। বড়লোক হয়েই প্রথমে শুধবে আমার এই দেনা, তারপর অন্য আসবাবপত্র কেনা। যাও, আর দেরী কোরো না।"

শুক্‌নো বালির মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর স্নেহশীতল অমৃতধারা···

প্রায় পাঁচ মাস হলো এই বোর্ডিংয়ের বাসিন্দা হয়ে আছে সুব্রত, কিন্তু ঐ টিউসানি ছাড়া আর কোনো ভালো কাজের সুরাহা করতে পারেনি এখনো।

সকালে উঠে 'রাজবাড়ী'তে চা খেয়ে সেই যে বেরিয়ে যায়, তারপর সকালের ছেলে-পড়ানো সেরে এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে আসে বেলা বারোটায়। ও বোর্ডার হবার পর থেকে শুধু কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখবার জন্যে দাদু অবলাবাবু তিনখানি বিখ্যাত দৈনিকপত্রিকার বাঁধা গ্রাহক হয়েছেন, ওর কাজের সন্ধান তিনিই ক'রে রাখেন কাগজ প'ড়ে, খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রামের অবসরে তিনি চাকরির তল্লাসে যেখানে-যেখানে যেতে বলেন ওকে, বেলা দুটোর সময় বেরিয়ে ওয়াদা মত তাদের কাছে গিয়ে যা শুনে আসে, সন্ধ্যের টিউসানি দুটো সেরে ন-টা রাত্রে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে বোর্ডিংয়ে ফিরেই তার রিপোর্ট দিতে যায় দাদুর কাছে···দাদু বলেন, "আগে বিশ্রাম কর্, খেয়ে নে, তারপর ধীরেসুস্থে বলবি, শুয়ে-শুয়ে শুনবো

সব” ব’লে হাতপাখাটা নিয়ে সুব্রতর মাথায় বাতাস করতে যান···বিব্রত হয়ে সুব্রত দাদুর হাত থেকে পাখাটা টেনে নেয়, বলে, “অপরাধের মাত্রাটা আমার আর বাড়াবেন না দাদু, তার চেয়ে আপনি শুয়ে পড়ুন, আমি একটু সেবা করি আপনাকে, সেই পুণ্যে যদি কিছু পাপ ক্ষয় হয় আমার।”···

সুব্রত ভাবে, জন্মজন্মান্তরের পরমাত্মীয় এই প্রবীণ দাদুটিকে কি শুভক্ষণেই যে ও না-চাইতে পেয়ে গেছলো···তারপর ‘তুমি-আমি’টা কোন্ অন্তরঙ্গ-মুহূর্তে ‘তুই-তোকারি’তে পরিণত হয়েছে তা আজ আর ওর মনে পড়ে না···

খাওয়া সেরে দাদুকে যখন সারাদিনের ফিরিস্তা দিতে যায়, তন্দ্রাতুর-চোখে দাদু বলেন, “কারা-কারা তাড়িয়ে দিয়েছে কি-কি ভাঁওতা দিয়ে সেইগুলো আগে বল্ ভাই।”

ম্লান হেসে সুব্রত বলে, “ভাঁওতা দিয়ে তাড়ালেও, আপনার আওতায় যে বাস করে তার আবার ভাবনা কিসের? প্রথমেই গেলুম ‘কিল্‌বর্ণ কোম্পানী’র অফিসে। আপনার নাম করতেই অধীরবাবু খাতির ক’রে বসালেন, সব শুনে আশ্বাস দিলেন সামনের মাসের ১৫ই নাগাদ একবার দেখা করতে··· ওকি দাদু, ঘুমুলেন নাকি?”

দাদু সে-প্রশ্নের মুখে কোনো জবাব না দিয়ে, নাক দিয়ে ডেকে বলেন, “তুমিও এবার শুয়ে পড়ো ভায়া, বুঝেছি সব।”

সুব্রত বালিশের ওপর মাথাটি রেখে আদেশ পালন করে

ঘুমন্ত দাদুর। ঘুম আসে না। স্মরণে আসে একমাস আগের সেনসাহেবের বাড়ীর দুর্ঘটনার কথা···সে অপমানের আঁচে আজও উত্তপ্ত হয়ে আছে ওর দেহ-মন। নিদ্রাদেবীর তপস্যা করতে হ'লে যে শান্ত একাগ্রতার দরকার সে বরাত নিয়ে কি এসেছে ও পৃথিবীতে? সুব্রতর জাগ্রত-চোখের অন্তরালে মনের স্বচ্ছ-চোখে দেখা দেয় শুভ্রজা। শুভ্রজাকে চিনেছে ও। পাঁচ বছর আগে এই মেয়েটি যখন ওর কলেজে ফার্ষ্ট-ইয়ারে পড়তো তখন দূর থেকে সেই অনুপম সুন্দরীকে শুধু ও দেখেছিল, তারপর এক কলেজ-ফাংসানে অন্যান্য মেয়েদের গানের পর শুভ্রজার ডাক পড়তেই সেদিনের-শোনা রবীন্দ্রনাথের সেই গানটি যখন সে গাইতে বসে তখন সহপাঠিদের একান্ত অনুরোধে ওকে সেতার বাজাতে হয়েছিল তার গানের সঙ্গে।

জীবনে প্রথম-দেখা এই সুব্রতর দিকে চেয়ে হঠাৎ মেয়েটি অত চমকে উঠেছিল কেন, তার কারণ ও তখন থেকে আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেনি।

তারপর আর-একদিন।

সেদিনের কথা জীবনে ভুলবে না সুব্রত:

সারা কলেজের প্রায় সমস্ত ছেলের দৃষ্টি থাকতো সেই মেয়েটির দিকে। ধনীর দুলালী শুভ্রজা মিঃ সেনসাহেবের প্রকাণ্ড মোটরে রোজ যাওয়া-আসা করতো···কলেজের গেটে, ওপারের ফুটে গাদি লেগে যেতো ছেলেদের···তার মধ্যে কয়েকটি ছেলে যে-চোখে চেয়ে থাকতো তার দিকে তার

গোপন-রহস্য তারাই জানতো, মেয়েটি কোনো দিন ভ্রূক্ষেপও করেনি তাদের দিকে। লজ্জায় রক্তরাঙা নত মুখে সে চলে যেতো তার গন্তব্য ক্লাসে···

তাতেই কি নিস্তার ছিল মেয়েটির? ছুটির পর মোটরে উঠে দরজা বন্ধ ক'রে বসবার সময় গাড়ীর গদির ওপর দেখতো একগাদা চিঠি···শোফারের অলস-মুহূর্ত্তে কোন্ ফাঁকে ফেলে-যাওয়া রকমারি ভঙ্গীতে লেখা প্রেম-নিবেদনের ন্যাকামি··· সাতরঙা রঙিন্ রামধনুর মত গদির এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্য্যন্ত অসভ্যরা নিপুণ হাতে নিখুঁত ক'রে সাজিয়ে রেখে গেছে যেন···

গাড়ী তখন ছুটে চলেছে বাড়ীর দিকে···নিরুপায় মেয়েটি পরের দিন কলেজে এসেই প্রফেসরের ঘরে ঢুকে সমস্ত চিঠিগুলি তাঁর টেবিলে দিয়ে ম্লানমুখে অপেক্ষা করতো সেগুলো প'ড়ে তিনি কি বলেন শোনবার জন্যে।

চিঠিগুলোর মর্ম্ম বুঝে পরে জানাবেন অবসর মত, এখন তাকে ক্লাস করবার আদেশ দিতেন প্রফেসর। প্রতিকারের প্রতীক্ষায় দিন গুণতো মেয়েটি।

সেদিন ওকে কলেজে পৌঁছে দিয়ে মোটর সেই যে চলে গেল, বিকেলে আর এলো না। আসবে না শুভ্রজা জানতো··· সেব বিশেষ জরুরী কাজে সেনসাহেবকে তিনটের সময়অফ ডায়মণ্ডহারবার যেতে হবে, ফেরবার সময় অনিশ্চিত, তাই শুভ্রজাকে তিনি ট্যাক্সিতে আসতে ব'লে দিয়েছেন সকালে।

ছুটির আগে কলেজের দরোয়ানকে ট্যাক্সি ডাকতে ব'লে ও অপেক্ষা করছে গেটে, গাড়ীর বিলম্বের জন্যে ওকে ইতস্তত করতে দেখে মনীশ রায় জানালে, দরোয়ানকে সে নিষেধ করেছে ট্যাক্সি ডাকতে, অনুগ্রহ ক'রে তিনি তার মোটরে গেলে সে ওকে পৌঁছে দিয়ে বালিগঞ্জে চলে যাবে তার অন্য কাজে··· কোনো চিন্তা নেই, সম্ভ্রান্তবংশের মেয়ের সম্মান আর আভিজাত্য কি ক'রে বজায় রাখতে হয় তা সে জানে।···ব'লে শুভ্রজার কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল একান্ত অন্তরঙ্গভাবে।

সেই সিরসিরে শীতের অপরাহ্নেও শুভ্রজার সারা দেহ স্বেদাক্ত হয়ে উঠেছিল। তাকে ঘিরে ছাত্ররা যে ব্যূহ রচনা করেছিল···সবাই তার এতটুকু উপকার করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে সতৃষ্ণদৃষ্টিতে যেভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল··· সেই মুহূর্তে আর-একটি ছেলে না এসে পড়লে সেখানেই হয়তো তার 'ফিট্' হতো।

সেই ছাত্র-ব্যূহ ভেদ ক'রে যে ছেলেটি এসে দাঁড়ালো, তাকে দেখে শুভ্রজা এই দ্বিতীয়বার চম্‌কে উঠলো—সে সুব্রত মিত্র।

সুব্রত বলেছিল, "আমি ট্যাক্সি ডেকে এনেছি, আমার চেনা ড্রাইভার, নিশ্চিন্ত মনে আপনি এই ট্যাক্সিতে উঠে চলে যান, আর দেরী করবেন না!"

আর দ্বিরুক্তি না ক'রে শুভ্রজা তখুনি ট্যাক্সিতে উঠেছিল··· অত ছেলের রহস্যঘন বাঁকা চাউনির সামনে এতটুকু কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও সুযোগ হয়নি সেদিন তার।

প্রয়োজনও কিছু ছিল না তার জন্যে সুব্রতর। মানুষের নিন্দা-স্তুতি প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা না ক'রে হে ভগবান্, আমায় শুধু এই সুমতি দাও, কর্ত্তব্য যত কঠোর আর যতই অপ্রিয় হোক্, তোমার আশীর্ব্বাদে যেন আমি জীবনাবসানের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে-ব্রত পালন ক'রে যেতে পারি···

আর শুভ্রজা ভাবছিল চলন্ত-গাড়ীতে ব'সে—ঐ যে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার নেমে আসছে এই ধূলার ধরণীতে, এ-রাত্রিও প্রভাত হবে। অন্ধকারের পর আলোর বিকাশ জগতের চিরন্তন রীতি। এই নিয়মেই পৃথিবীর আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন হচ্ছে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে।

জগতে মনীশ রায়ও আছে—সুব্রত মিত্রও আছে।

সেদিনের সেই ঘটনার পর থেকে শুভ্রজা আর কলেজে আসেনি। শোনা গেল, 'ট্রান্সফার' নিয়ে সে চলে গেছে বেথুন কলেজে।

মিঃ সেনের বিধবা পুত্রবধূ শুভ্রজা।

এ-পরিচয় সুব্রত পায়নি। তাকে মিঃ সেনের কন্যা বলেই জানতো ও। পরিচয় পেলে সেদিন মতিলালের কথায়।

এলগিন রোডের বাড়ীতে সন্ধ্যায় সেই দুর্ঘটনার পর এক মাস পরের কথা।

শ্রান্ত দেহ-মন নিয়ে বোর্ডিংএ ফিরেছে সুব্রত, হাতে একটা প্যাকেট, কাপড়-জামা আছে তাতে। প্রথমেই ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে নমস্কার ক'রে বললে, "আজ টিউসানির বেতন

পেয়েই ভাবলুম, ভেক না হ'লে যখন ভিক্ষেও মেলে না, তখন আমার এই জরা-জীর্ণ দেহ আর শতছিন্ন রাজবেশ দেখে লোকে দূর-দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে না তো আমায় চাকরি দেবে কে? তাই কাল থেকে বাবু সেজে চাকরির উমেদারিতে বেরুবো ব'লে নতুন কাপড়-জামা কিনে আনলুম সার্—আপনার টাকা আগে মজুত ক'রে রেখে অবশ্য। এই নিন্ আপনার টাকা, সময় মত বিলটা 'ইনফুল' ক'রে দেবেন যখন সুবিধে হবে।"

একটু হেসে বিমানবাবু বললেন, "তা না হয় হলো, কিন্তু আপনার খোঁজে এসে দুপুর থেকে এক ভদ্রলোক তিন-তিনবার ফিরে গেলেন যে। আপনি জানিয়ে যান না কেন কখন ফিরবেন! যান্ যান্, শীগগির যান্, অবলাবাবু খোশ গল্পের হাসি-খুশীতে তাঁকে মাতিয়ে রেখেছেন তাই এখনো ব'সে আছেন তিনি আপনার অপেক্ষায়।"

"আমার অপেক্ষায়? আমার মতন অভাজনের জন্যে অপেক্ষা করবে এমন কে আছেন আমি তো ঠিক মনে করতে পারছি না!"

বললে বটে এ-কথা সুব্রত, কিন্তু সত্যিই আর এ-ঘরে অপেক্ষা না ক'রে তাড়াতাড়ি উঠে চললো নিজের ঘরের দিকে।

আগে কি কথা হচ্ছিলো ওঁরাই জানেন, সে-কথার জের টেনে হা-হা ক'রে হাসতে-হাসতে মতিলাল বললে, "কিন্তু আমি ভেবে পাই না, এমন এঁদো-পড়া চটা-ওঠা একতলা বাড়ীর নাম 'রাজবাড়ী-বোর্ডিং' হলো কেন, আর আপনারাই-বা কোন্ সুখে এই শেওলা-পড়া বাড়ীতে বাস ক'রে এমন নধর শরীর বজায় রেখে সুখে-স্বচ্ছন্দে হাসতে পারছেন। তাহলেই বুঝতে হবে, এই রাজবাড়ীতে নিশ্চয়ই আপনারা রাজার হালে আছেন।"

হাসতে-হাসতে অবলাবাবু বললেন, "রাজার হাল কি হাড়ির হাল আজ রাতটা এখানে থেকেই ছাখো না ভাই।... মশা-মাছি-মাকড়সা-আরশুলা-টিকটিকি-গিরগিটি-ইঁদুর-ছুঁচো আর চাম্‌চিকের ঐকতানে এ-স্থানটি একেবারে বারো-ইয়ারীর সভা গুলজার-করা একটা 'পাণ্ডেল' মনে হবে তোমার। তবে হ্যাঁ, যার খাই তার নিন্দে করা মহা পাপ হিসেবে বলছি, আর যাই হোক্, এমন খাঁটি জিনিসে তৈরী খাবার তুমি আর কোথাও পাবে না, আর সেইজন্যেই আমার এমন 'নন্দঘোষের নন্দন'-এর মতন দুধে-ঘীয়ে পুষ্ট নধর শরীর দেখে তোমার হিংসে হচ্ছে। সত্যি বলছি, আমার খরচে তুমি তিনটি মাস এখানে থেকে ছাখো, তোমার ওই ছিমছিমে শরীরের কিরকম 'চেঞ্জ' হয়ে যায়। আরে ভায়া— যাক্, এবার 'রাজবাড়ী'র ইতিহাসটা বলি শোনো :

চিরবান্ধবী

শেয়ালদা থেকে গোয়ালন্দ-মেলে গিয়ে প্রায় শেষের দিকের স্টেশন 'রাজবাড়ী'-জংসনে গাড়ী বদল ক'রে যেতে হতো ফরিদপুরে। সেই 'রাজবাড়ী' স্টেশনের ঠিক নীচেই সবুজ ঘাসের ছোট মাঠের ওপর একটি সাজানো বাংলোয় ছিল যে পান্থনিবাস, গ্রামের নামে তার নামকরণ হয়েছিল—'রাজবাড়ী-বোর্ডিং'।...

সেই গ্রামের বাসিন্দা এক শিক্ষিত ভদ্রলোক তাঁর সাধ্য-মত চেষ্টায় বিশুদ্ধ ভিটামিন্‌যুক্ত খাবার পরিবেশনের সঙ্গে 'সেনিটোরিয়াম'-এর মতন স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের বন্দোবস্ত ক'রে ট্রেনের যাত্রী আর সাধারণের কাছে যে সুনাম কিনে-ছিলেন, একদিন 'রায়ট'-এর দাপটে সে-সব ওলটপালট হয়ে যেতেই তিনি সেই সাজানো বোর্ডিংএর সব-কিছু ফেলে রেখে কলকাতায় পালিয়ে এসে সেই নামেই এই বোর্ডিং খোলেন, আর তাঁর মতন স্থানত্যাগ ক'রে পালিয়ে-আসা স্থানীয় লোকদের সাহায্যে আগেকার মতন সুখ্যাতির সঙ্গে এখানেও চালিয়ে আসছেন তাঁর সেই যত্নে-গড়া রাজবাড়ী বোর্ডিংটি।...

আমি সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের দেশ নৈহাটির স্থায়ী অধিবাসী হলেও, ফরিদপুরে আমার কিছু সম্পত্তি থাকায় তার মামলা-মকদ্দমার তদ্বিরের জন্যে প্রায় আমায় যেতে হতো সেখানে, আর শুধু 'রাজবাড়ী-বোর্ডিং'য়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসবার লোভে নেমে পড়তাম রাজবাড়ী-স্টেশনে, তারপর মামলার

তারিখের পরেও হপ্তাখানেক সেই বোর্ডিংয়ে বাস ক'রে তবে ফিরতাম বাড়ীতে।...

যৌবনে ব্যবসা ক'রে যে সুনাম আর যা-কিছু সঞ্চয় করেছিলাম, প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় পা দিয়ে আমার একমাত্র ছেলের হাতে সে-সব তুলে দিলাম, ছেলে আমার একগুণ রোজগারের ব্যবসা হাজার গুণ বাড়িয়ে ফলাও ক'রে দু-হাতে টাকা রোজগার করতে লাগলো, আমায় বললে, আপনাকে আর ব্যবসার গদিতে বসতে হবে না এই অপটু শরীর নিয়ে, এবার আপনি বাড়ীতেই বিশ্রাম করুন গিয়ে। ভাবলাম, পরি-ত্রাণ পেলাম, কিন্তু তখন কোথায় ত্রাণ? পরীদের উৎপাতে ত্রাহি-ত্রাহি বলতে-বলতে পালিয়ে এসে তবে পাই পরিত্রাণ।... ব্যাপারটা হচ্ছে, শত্রুর মুখে 'রাবড়ি' দিয়ে মা-ষষ্ঠীর কৃপায় বৌমার আমার শুধু কন্যাসন্তান পুরো এক ডজন। তার মধ্যে বড়টির বিয়ে হয়ে গেছে মাসকয়েক আগে মণিরামপুরের এক বড়লোকের ছেলের সঙ্গে" বলেই কি যেন একটু ভাবলেন, ভেবে জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে চল্‌তি-কথার খেই হারিয়ে ফেলে বললেন, "ঐ যা! বুড়ো হ'লে যে লোকের 'ভীমহিড়িম্বা' হয়, আমারও হয়েছে তাই। এই ছ্যাখো না—"

শুনেই হঠাৎ মতিলালের মাথার ঘিলু চম্‌কে উঠলো, বললে—"ভীমহিড়িম্বা? সে আবার কি?"

একগাল হেসে অবলাবাবু বললেন, "সেটা এমন-কিছু চম্‌কাবার মতন কথা নয় ভায়া, এই তোমরা যাকে বলো

'ভীমরতি', আমি তাকে বলি 'ভীমহিড়িম্বা'। ভীমের পাশে কি রতি মানায়? রতিকে মানায়, মদনের পাশে। যাক্‌গে-মরুক্‌গে—কি বলছিলাম বলো তো ভায়া?"

মতিলাল বললে, "বলছিলেন, 'শত্রুর মুখে রাবড়ি দিয়ে'—"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অবলাবাবু বললেন, "না না, তারপরেও কিছু যেন বলেছি—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। যা বলছিলাম তার পরের কথা হচ্ছে এই যে, বড় নাতনীটির তো বিয়ে হয়ে গেল বড়লোকের ছেলের সঙ্গে। বাকি কচি-কাঁচা-ডাঁশা-ডাগরডোগর বিননি-ঝোলানো সোমত্ত যে এগারোটি, তাদের ঠাট্টা-তামাসা-ইয়ারকির বাক্‌যুদ্ধে হেরে গিয়ে পালিয়ে এসে আমার চেনা এই 'রাজবাড়ী'র অন্দরে ঢুকে লুকিয়ে ব'সে আছি। ফি মাসকাবারে ছেলের কাছ থেকে মণিঅর্ডারে টাকা আসে আর আমি দু'হাতে—"

হঠাৎ বৃদ্ধ সামনের দিকে আঙুল দেখালেন—"ঐ আমার সুব্বেরতো-ভায়া আসছে। তুমি আর-একদিন এসো ভাই। কি আনন্দ যে পেলাম এতক্ষণ তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে—"

মতিলাল ব'লে উঠলো, "কৈ? কৈ? কোথায় সুব্রতবাবু?"

অবলাবাবু বললেন, "ঐ তো হে, তোমার নাকের ডগায় সোজা ঐ যে একটা কাগজের বাণ্ডিল না কি হাতে ক'রে এগুচ্ছে এই ঘরের দিকে।"

মতিলাল অবাক্ হয়ে আগন্তুকের দিকে চেয়ে থাকে। অবলাবাবুর ইসারা ঠিক বুঝতে পারে না। ও ভদ্রলোক

কেমন ক'রে সুব্রতবাবু হতে পারেন? বললে, "না না দাদু, উনি নন্, তিনি অন্য লোক। আমি যাঁর অপেক্ষায় ব'সে আছি তিনি হচ্ছেন সুব্রত মিত্র।"

অবলাবাবু বললেন, "আরে ভায়া, সুব্বেরতো শুধু তোমার কেন, সবারই মিত্র। শত্রু বলতে জগতে ওর কেউ নেই!" ব'লে ওদের কি কথাবার্ত্তা হয় শোনবার জন্যে চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন। আর-একবার মতিলাল পরখ ক'রে দেখবে উনি সেই সে-রাত্রের গোঁফদাড়িওলা সুব্রতবাবু—গোঁফদাড়ি কামিয়ে এখন এইরকম দেখাচ্ছে কি না, এমন সময় সুব্রত ঘরে ঢুকেই ব'লে উঠলো, "হ্যালো মিঃ রয়, আপনি হঠাৎ এখানে কি মনে ক'রে?"

আগন্তুকের মুখে 'মিঃ রয়' শুনেই উবু হয়ে ব'সে প'ড়ে সেই যে মতিলাল হাঁটু দুটির মধ্যে মুখ লুকিয়ে ব'সে রইলো, তারপর আর মুখও তুললে না, সুব্রতর প্রশ্নের কোনো জবাবও দিলে না। সে তখন ভাবছিল, তাহলে এই ভদ্রলোকই সেই লোক, নইলে এ সঙ্কেতবাণী তো তারা দুজন ছাড়া আর কেউ জানে না··· দিদিমণিকে তখনই বললাম, আর-কাউকে পাঠান, কি—"

সুব্রত বললে, "হঠাৎ আপনার এখানে আসার উদ্দেশ্যটা এবার ব'লে ফেলুন মিঃ রয়, আর ভয় দেখাবেন না আমায়। সেদিন আপনার হাতে দেখে এসেছি বন্দুক, আজ আবার বোমা-টোমা কিছু এনেছেন নাকি পকেটে ক'রে?"

'বোমা' 'বন্দুক'-এর নাম শুনে অবলাবাবু সহসা এমন

দুর্ব্বল হয়ে পড়লেন যে, ওঁর কপট-নিদ্রা ভেঙে গেল···চোরা-চোখে চেয়ে দেখলেন, বোমা ফাটতে আর দেরী কত। চিত্ত-বিশ্রামের জন্যে লোকচক্ষুর আড়ালে থেকেও বারুদের আগুন ছিট্‌কে এই তক্তাপোষে যদি ওঁর অপঘাত হয় এখন···

আর ভাবতে পারলেন না। অন্তিমকাল উপস্থিত জেনে শুয়ে-শুয়েই পৈতেটা হাতে জড়িয়ে অবলাবাবু ইষ্টমন্ত্র জপতে লাগলেন। আর মতিলাল হাঁটু থেকে মুখ না তুলে সেই অবস্থাতেই শুধু হাত দুটো জোড় ক'রে বললে, "আমার বড় লজ্জা করছে সার্, এ কালামুখ দেখাতে আপনাকে। আগে যদি জানতে পারতাম আপনার 'পজিসান'টা—ছি ছি।"

সুব্রত বললে, "এত লজ্জা পাবার তো কিছু নেই ভাই। মনিবের মান-ইজ্জত বজায় রাখবার জন্যে আজকের এই বেইমানির দুনিয়ায় আপনাকে একজন অদ্বিতীয় প্রভুভক্ত বলেই মনে হচ্ছে আমার। সেদিনের সেই ঘটনায় আপনি যা করেছেন তার জন্যে আপনার আদর্শ পুরস্কার পাওয়া উচিত। আমি খুব খুশী হয়েছি আপনার সেদিনের সেই ব্যবহারে। এবার মুখ তুলে আপনার বক্তব্যটা বলুন, হঠাৎ আমাকে কি এমন দরকার পড়লো যে, এত কষ্ট ক'রে এতক্ষণ আপনি অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছেন আমার জন্যে, মিঃ রয়।"

এবার মতিলাল মুখ তুললে বটে, কিন্তু বাঁ-হাত দিয়ে নিজের চোখ দুটো টিপে ধ'রে বললে, "ও মিষ্টার কিংবা রয়-টয় নয় সার্, যা রয়-সয় তাই ব'লে ডাকলেই আমি খুব

খুশী হবো। দোহাই আপনার, আপনি আমায় মতিলাল—না না, শুধু মতি ব'লে ডাকলে তবে আমি চাইবো আপনার দিকে। এ কি কম লজ্জার কথা? ক্লাস ফোর্ পর্য্যন্ত বিদ্যে আমার, আমি গেছলাম ডবল এম-এ আপনি, আপনার সঙ্গে ইংরিজী-বুলি কপ্‌চে সমানে ঝগড়া করতে! ধিক্ আমাকে।"

সুব্রত বললে, "আপনি আপনার কর্ত্তব্য পালন করেছেন, তার জন্যে আপনাকে আর অনুতাপ করতে হবে না মতিবাবু, সারাদিনের পরিশ্রমে আমি বড় ক্লান্ত, যা বলবার বলুন এবার।"

চোখ চাইলে মতিলাল। বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললে, "দিদিমণি একখানা চিঠি দিয়েছেন আপনাকে। আমার ওপর হুকুম আছে সেটা আপনার হাতে পৌঁছে দিতে, এই নিন্।" ব'লে পকেট থেকে একটা এন্‌ভেলাপ্ বের ক'রে সুব্রতর হাতে দিলে।

সুব্রত বললে, "আমাকে চিঠি দিয়েছেন আপনার দিদিমণি—শুভ্রজাদেবী?"

কম্পিত-হাতে চিঠিখানা নিতে যায় সুব্রত। বোমার বদলে পকেট থেকে চিঠি বেরুতে দেখে—বিশেষ ক'রে আবার দিদিমণির লেখা চিঠি শুনে ধড়মড় ক'রে তক্তাপোষের ওপর উঠে বসেন অবলাবাবু, মতিলালের দিকে চেয়ে বলেন, "ওদিকে নয় ভায়া, আমার হাতে দাও। আমি হচ্ছি সুব্বের্‌তো-ভায়ার প্রাইভেট সেক্রেটারী। প্রাইভেট চিঠিপত্র আগে আমি পড়বো,

তারপর দেবো ওকে।” ব’লে গম্ভীর মুখে হাতখানা প্রসারিত ক’রে দেন মতিলালের দিকে।

মতিলাল বলে, “কিছু মনে করবেন না দাদু, আমার ওপর হুকুম আছে দিদিমণির, সুব্রতবাবুর হাতে দিতে।”

অবলাবাবু বললেন, “তবে তাই দাও ভায়া। লেডীর সম্মান আগে।” ব’লে হাসতে-হাসতে আবার শুয়ে পড়লেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

সুব্রতর দিকে ফিরে মতিলাল বললে, “চিঠিতে কি লেখা আছে জানিনা, তবে দিদিমণি আমায় সঙ্গে ক’রে নিয়ে গেছলেন মিঃ গাঙ্গুলী অর্থাৎ প্যামেলা নামে গাউন-পরা যে মেমসাহেবটিকে দেখেছিলেন সেদিন, তার বাবার কাছে। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার কথাই বোধকরি লিখেছেন দিদিমণি আপনাকে। পোর্টকমিশনার অফিসের হায়ার-অফিসার তিনি, সেখানে তাঁর প্রভুত্ব সব বাঙালীর চেয়েই খুব বেশী। কিন্তু বাঙালী হলেও মনে-প্রাণে তিনি একেবারে খাঁটি বিলিতি সাহেব। তাঁর মেয়ে প্যামেলাকে আজও রেখেছেন ‘কন্‌ভেণ্ট’-এ একজন মেম-গভর্ণেসের জিম্মায় তাঁরই কাছে। বাপ-মেয়ের সঙ্গে ভেতর-বাড়ীর কোনো সম্পর্ক নেই…অন্দরে খাঁটি হিন্দু স্ত্রী তাঁর পুজো-আচ্ছা নিয়ে আছেন, বাইরে এদিকে স্বামী আর মেয়ে খাস বিলিতি-চালে কি যে না করছেন তা বলা যায় না। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার কথা যদি লিখে থাকেন চিঠিতে তাতে আপনার ভালোই হবে। তবে আমি সাবধান ক’রে দিয়ে যাচ্ছি

আপনাকে—ভুলেও যেন বাংলায় কথা কইবেন না তাঁর সঙ্গে। কারণ তিনি বাঙালী হয়েও নিজে বাংলায় কথা কন্ না, খান্ ইংরেজী-খানা, চলাফেরা সবই তাঁর ইংরেজী-অনুকরণে, স্বপ্নও ছ্যাখেন নাকি ইংরেজীতে।”

বলতে-বলতে মতিলাল হেসে ওঠে। তারপর আবার বলে, “খুব সম্ভব মিঃ গাঙ্গুলীর সঙ্গে অফিসে দেখা করলে একটা ভালো চাকৃরিই পেয়ে যাবেন আপনি। আমায় বাইরে রেখে দিদিমণি একলা দেখা করেছিলেন তাঁর জেঠামণি মিঃ গাঙ্গুলীর সঙ্গে···কথা কইবার সময় টুক্‌রো ছু-একটা কথা যা আমার কানে এসেছিল তাই থেকে আমার যা ধারণা হয়েছে তাই ব'লে গেলাম আপনাকে। সেদিনের সেই ঘটনার পর থেকে দিদিমণির এখন চিন্তা হয়েছে শুধু কি ক'রে আপনার কিছু উপকার করতে পারবেন তিনি।’

সুব্রত বললে, “সে আমার পরম সৌভাগ্য, আর তার জন্যে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মিস্ সেনকে—”

ভারাক্রান্ত মনে মতিলাল ব'লে উঠলো, “মিস্ আপনি কাকে বলছেন সার্? তিনি তো মিসেস্, মানে, মিঃ সেনের বিধবা পুত্রবধূ। বিবাহ হয়েছিল ঐ পর্য্যন্ত। তারপর ফুল-শয্যার রাত্রি ছাড়া দিদিমণি তাঁর স্বামীকে আর সুস্থ অবস্থায় চোখে ছ্যাখেননি কোনোদিন।”

“কি বলছো তুমি মতিবাবু?” ব'লে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলো সুব্রত মতিলালের মুখের দিকে।

ভারি-গলায় মতিলাল বললে, "যা বলছি, এই সত্য। একে আর অস্বীকার করা চলে না। ফুলশয্যার রাতটা কিভাবে কেটেছিল কে জানে, ভোরে উঠেই হঠাৎ বাড়ীতে হুলস্থুল প'ড়ে গেছলো।···নতুন জামাইবাবু নাকি কাসতে-কাসতে হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, সেই আকস্মিক বিপদে উদ্বিগ্ন হয়ে সেনসাহেব তখুনি ফোন্ ক'রে, লোক পাঠিয়ে তাঁর বন্ধু আর নতুন বৈবাহিক, দিদিমণির বাবা ব্যারিষ্টার অমলেন্দু গাঙ্গুলীকে আনিয়ে তখুনি ডাক্তারে-ডাক্তারে বাড়ীটা একেবারে হাঁসপাতালে পরিণত করেছিলেন, ডাক্তাররা 'কন্‌সাল্ট' ক'রে জানিয়েছিলেন, খুব সম্ভব এটা 'থ্রম্বোসিস্'-রোগের 'ফার্ষ্ট এ্যাটাক্', এখুনি এঁকে হাঁসপাতালে নিয়ে যান্। তাই হয়েছিল···কিছুক্ষণ চিকিৎসার ফলে জ্ঞান ফিরে আসতেই জামাইবাবুকে হাঁসপাতালে দেয়া হয় এবং সেখানে গিয়ে মাসখানেক তিনি বেঁচেছিলেন, তারপর—"

আর বলতে পারে না মতিলাল।

সুব্রত একটা শ্বাস টেনে নিয়ে সজোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালে।

মতিলাল বলে, "আমি সব শুনেছি—সব জানি। আরো একটা গোপন কথা যা জানি, যাবার সময় ব'লে যাই সার্ আপনাকে—দিদিমণিরা ব্রাহ্মণ আর আপনি কায়স্থ না হ'লে, দিদিমণির স্বামীর সঙ্গে আপনার চেহারার এত মিল আছে যে, আপনাদের দু'জনকে যমজ-ভাই বললেও কেউ অবিশ্বাস করতো না। আবার যেদিন যাবেন আমাদের বাড়ীতে,

দিদিমণির ড্রইংরুমে-টাঙানো একখানা 'বাষ্ট-পোট্রেট'-এর সঙ্গে আপনার এই চেহারার কিরকম সাদৃশ্য আছে দেখলেই বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, আজ ছুটি দিন আমায়, এরপর যেদিন আবার দেখা হবে সেদিন—মিঃ গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা ক'রে আপনার আশা পূর্ণ হয়েছে শুনলে আমার আনন্দের আর সীমা থাকবে না। সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় দিন গুণবো আজ থেকে।" ব'লে যুক্তকর অভিবাদন জানিয়ে মতিলাল চলে গেল।

সুব্রত একবার অবলাবাবুর দিকে চেয়ে দেখলে, দারুণ তৃপ্তিতে তিনি তখন গভীর ঘুমে ডুবে আছেন। এই অবসরে চিঠিখানা প'ড়ে নেয়া যাক্ ভেবে স'রে গিয়ে আলোর নীচে ব'সে খামটা ছিঁড়ে দেখলে, সরল সোজা কথায় অনাড়ম্বর অল্প কয়েকছত্র লেখা :

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

সেদিন আপনার পরিচয় পাবার আগে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেম, বাবার সঙ্গে কথা ক'য়ে যদি চাকৃরি পাওয়া সম্ভব হয় তো আপনাকে খবর দেবো। বাবার অফিসে কোনো কাজ খালি নেই। কিন্তু তাঁকে আপনার আমূল পরিচয় দেবার পর তিনি তাঁর বন্ধুস্থানীয় আমার জেঠামণি, 'পোর্টকমিশনার-অফিস'-এর সম্মানীয় শ্রেষ্ঠ অফিসার মিঃ গাঙ্গুলী-সাহেবকে অনুরোধ ক'রে আপনার একটি ভালো চাকৃরির ব্যবস্থা করেছেন,

অভিমান না ক'রে আগামী-কাল আপনি ঐ অফিসে গিয়ে আপনার নামের 'শ্লিপ' দিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেই যে সে-কাজটা পাবেন তার আর কোনো ভুল নেই। চাকৃরি পাওয়ার পর আপনার অবসরমত সেন-সাহেবের—মানে, আমার বাবার সঙ্গে একদিন দেখা ক'রে তাঁর ব্যথিত-মনের শান্তির কারণ হবেন আশা ক'রে মতিলালের হাতে এ-চিঠিখানি পাঠালেম, বাকি অনেক কথা যেদিন আমাদের বাড়ীতে আসবেন সামনে বলবার ইচ্ছে রইলো। ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষিনী—শুভ্রজা।"

চিঠিখানি প'ড়ে এতক্ষণ পরে সুব্রত জামাটা খুলে রেখে দক্ষিণ দিকের বন্ধ-জানলাটা খুলে দিয়ে উদাস দৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো। ওর ভাবনার আর আদি-অন্ত নেই। ...ভগবান যাকে রূপের অত ঐশ্বর্য্য দিয়ে পাঠিয়েছেন পৃথিবীতে, সে-রূপের সম্মান রাখবার জন্যে এত-বড় বিশ্বে মাত্র একটি শুদ্ধাত্মাকে দান দিলে কি এমন ক্ষতি হতো তাঁর সৃষ্টির? শুভ্রজা। বালবিধবা শুভ্রজাদেবীর রূপের প্রশংসা বা চিন্তা করা ওর মহাপাপ হতে পারে, কিন্তু তাঁর দুঃখে সমবেদনা জানিয়ে শ্রদ্ধায় দু' ফোঁটা অশ্রুজল অর্ঘ্য দিতে তো আর বারণ নেই কিছু।...

আর-একটা কথা মনে এসে ওকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুললে—শুভ্রজাদেবীর স্বামীর সঙ্গে নাকি ওর চেহারার হুবহু মিল

আছে। সেটাও কি ওর অপরাধ? অপরাধ না হলেও এরপর তার সঙ্গে ভাই-বোনের মনোবৃত্তি নিয়ে সামনাসামনি কথাবার্ত্তা কওয়াটা যে ওর আত্মপ্রত্যয়ের পক্ষে কতটা অন্তরায় হবে বুঝে মনের কাছে ও খুব খাটো হয়ে পড়লো। মনে হলো, সেইজন্যেই বোধহয় কলেজ-ফাংসানে গানের আসরে আর কলেজের গেটে ট্যাক্সি ডেকে আনার সময় ওকে দেখে শুভ্রজাদেবী দু-দু'বার হঠাৎ চম্‌কে উঠেছিল। ভবিতব্যতা। মানুষকে ব্যথা দেবার জন্যেই যদি জগতে ওকে পাঠিয়ে থাকেন জগদীশ্বর···এই যদি ওর বিধিলিপি হয় তাহলে তার প্রতিকার আর ও কি করবে! আর ভাবতে পারে না সুব্রত।

ব্যারিষ্টার অমলেন্দু গাঙ্গুলীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শুভ্রজা।

সমবয়সী ভগ্নী প্যামেলার সঙ্গে শুচিতা-হিসেবে ওর সম্পর্ক আকাশ-পাতাল হলেও তবু সে মাঝে-মাঝে আসে শুভ্রজার কাছে বাল্যসখীত্বের প্রীতির সম্পর্ক ভুলতে না পেরে।

আবাল্য আদরে-সোহাগে লালিত শুভ্রজাকে ক্ষণিকের জন্যেও চোখের আড়াল করতে চাইতেন না তার বাপ-মা। বাবা অমলেন্দু ছিলেন মিঃ সেনের অভিন্নহৃদয় বন্ধু, বাল্যকাল হতেই দুজনে খেলাঘরের বেহাই সম্পর্ক পাতিয়েছিলেন এবং স্কুলের

পাঠ শেষ ক'রে যৌবনে একসঙ্গে কলেজে অধ্যয়ন করার পর বিদ্যার্জ্জনের জন্যে ইওরোপে গিয়েও সে-সম্পর্কের কথা ভুলে যাননি।

বিবাহে কুল-প্রথা বা শ্রেণীভেদ সম্বন্ধে এতটুকু গোঁড়ামি ছিল না দুই বন্ধুর, তাই মিঃ সেনের ছেলে অমর জন্মাবার তিন বছর পরে মিঃ গাঙ্গুলীর মেয়ে শুভ্রজা যখন জন্মালো তখন উভয়ের আনন্দের সীমা রইলো না···এবার তাঁদের তাসের প্রাসাদ—পাথরের অট্টালিকায় পরিণত হবার সুযোগ এলো, কিন্তু প্রচণ্ড বাধা দিলেন মিসেস্ গাঙ্গুলী। তিনি কিছুতেই মিঃ সেনের ছেলের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিবাহ দেবেন না। এই নিয়ে বাধলো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভীষণ কলহ এবং মণিকা গাঙ্গুলী তাঁর দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে হঠাৎ চলে গেলেন দার্জ্জিলিংয়ে, আর সেই শুভ অবসরে অমলেন্দু তাঁর পনেরো বছরের মেয়ে শুভ্রজার সঙ্গে মিঃ সেনের আঠারো বছরের ছেলে শৈশবে মাতৃহীন অমরের বিবাহ দিয়ে দিলেন রীতিমত রেজেষ্ট্রী ক'রে।

খবর পেয়ে ফিরে এলেন শুভ্রজার মা মণিকা গাঙ্গুলী, এসে একটা খণ্ডপ্রলয় বাধিয়ে তুললেন স্বামীর সঙ্গে, কিন্তু যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই জামাই বিবাহের পর এক মাসের মধ্যেই মারা গেল। এ-অবস্থায় সাধারণ মায়েরা যা ক'রে থাকেন, মণিকা গাঙ্গুলী তার বিপরীত পথ ধরলেন, মেয়ের আবার বিবাহ দেবার জন্যে প্রাণপণে বিধবা-বিবাহের অনুকূলে

যা-কিছু করা দরকার কোনোটাকেই বাদ দিলেন না। ঘটক-ঘটকি, বিবাহের দালাল, প্রজাপতি-অফিস, আর্য্যসমাজ ইত্যাদি যেখানে-যেখানে তাঁর পণরক্ষার সুবিধা আছে, নিজে এবং অপারক-বিধায় লোক লাগিয়ে সে-চেষ্টার ত্রুটী রাখলেন না কিছু।

এদিকে অপূর্ব্ব সুন্দরী শুভ্রজার পাত্রেরও অভাব হলো না··· মায়ের পছন্দমত অনেক ছেলেই এগিয়ে এলো শুভ্রজার অন্নবস্ত্রের ভার নিয়ে তাকে বৈধব্য-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে, পিতা অমলেন্দু তাতে বাধাও দিলেন না, একটি কথাও বিবাহের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করলেন না।

বেঁকে বসলো শুভ্রজা নিজে।

ক্লাস 'টেন'-এর ছাত্রী, ষোলো বছরের কোঠা পার হয়নি এখনো তার, সে বললে, "কিসের বিয়ে? আমি কি কুমারী-মেয়ে যে আমার বিয়ে হবে? একবার বিয়ে হবার পর ভাগ্যদোষে যখন বিধবা হয়েছি, হিন্দুর মেয়ের তখন আর দু'বার বিয়ে হতে পারে না।···লেখাপড়া নিয়েই থাকবো আমি, বিয়ের কথা তুলে কেউ আমায় জ্বালাতন কোরো না।"

শুনে বাপের মুখ উজ্জ্বল হলো, উত্তেজিত হয়ে উঠে মা বললেন, "বিয়ের কথায় কথা কইতে লজ্জা হচ্ছে না একরত্তি মেয়ের? ওসব চলবে না। যতক্ষণ আছি আমার হুকুম মানতেই হবে। লেখাপড়া? বিয়ের পরেও লেখাপড়া করা চলবে, কেউ বাধা দেবে না। আজ বিকেলে যাঁরা দেখতে

এসে কথা পাকা ক'রে যাবেন, তাঁদের কাছে কোনো অসভ্যতা প্রকাশ পায় না যেন।"

তখনকার মত শুভ্রজা চুপ ক'রে গেল বটে, কিন্তু স্কুলে গিয়ে আর বাড়ী ফিরলো না। বিকেলে সোজা চলে গেল এলগিন রোডে তার শ্বশুরবাড়ীতে, গিয়ে মিঃ সেনের সঙ্গে দেখা ক'রে প্রণাম ক'রে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে জানালে, এখন থেকে সে তাঁর পদাশ্রয়েই থাকবে, মূলেন ষ্ট্রীটে বাপের বাড়ীতে কোনো দিনই যাবে না আর।

মিঃ সেনের চোখে জল আসে···অমর মারা গেছে, তার শূন্য স্থান পূর্ণ করতে এসেছে তার বিধবা স্ত্রী। পুত্রহারা পিতা নীরবে বউমার মাথায় হাত বুলোতে থাকেন···হারানো-অতীত মুখর হয়ে ওঠে তাঁর মনের মণিকোঠায়···সহসা আবার থেমে যায় সব কলরব। সবই কেমন বেসুরো মনে হয়। যে গান থেমে গেছে—ছিঁড়ে গেছে যে বীণার তার, গ্রন্থি দিলে তাতে কি আর আগের সে সুর বাজে? আরো একটা ভাববার কথা এই যে, অমরের অভাবে তাঁর খালি বুকটা যেমন খাঁ খাঁ করছে, শুভ্রজাকে এখানে আটক রাখলে, ওর বাপ-মার অন্তরটাও তো তেমনি ধূ ধূ মরুভূমি হয়ে যাবে। তার চেয়ে—

তখুনি উঠে পাশের ঘরে গিয়ে 'রিং' করলেন বাল্যবন্ধু বৈবাহিক মিঃ গাঙ্গুলীকে। তারপর যথাসময়ে শুভ্রজার বাবা আসতেই তাঁকে নিয়ে যেতে বললেন তাঁর মেয়েকে।

মিঃ গাঙ্গুলী জানালেন—এ হতে পারে না। শুভ্রজা বালিকা হলেও মায়ের চেয়ে ওর বুদ্ধি বেশী। নিজের মতে ও যা ভালো বুঝেছে তার ওপর একটি কথাও কইবেন না তিনি।

কিন্তু ছাড়লেন না মিসেস্ গাঙ্গুলী। মেয়ের জিদ্, বিবাহে অনিচ্ছা আর মিঃ সেনের বিধবা-পুত্রবধূ আটক করার বিপক্ষে কোর্টে অভিযোগ নিয়ে এলেন।

মামলার দিন শুভ্রজা কোর্টে হাজির হয়ে জানিয়ে এলো, বিবাহিতা হয়েও বর্ত্তমানে হিন্দু-বিধবা সে, বিধবার মতোই আচার-অনুষ্ঠান পালন আর লেখাপড়ার চর্চ্চা নিয়ে থাকতে চায় এবং পিতারও তাতে সম্পূর্ণ মত আছে। কিন্তু আধুনিক-চালচলনে অভ্যস্তা মা তাঁর জোর ক'রে তাকে বিবাহ দিয়ে নিজের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলতে বলছেন, এ-অবস্থায় মার আদেশ পালন করা তার পক্ষে সাধ্যাতীত—ইত্যাদি।

মিসেস্ গাঙ্গুলীর আবেদন অগ্রাহ্য ক'রে বিচারক নাকচ ক'রে দিলেন মকদ্দমা। মামলা ডিসমিস হয়ে যেতেই গর্ব্বিত-পদে কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসবার পর দয়ালু শ্বশুর মিঃ সেনের বাড়ীতেই বাস করছে শুভ্রজা তখন থেকে। মা তাঁর এই মেয়েটির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করেছেন, এর নাম পর্য্যন্ত আর মুখে আনেন না।

শুভ্রজা নিশ্চিন্ত মনে খুলে ফেলেছে তার গায়ের অলঙ্কার··· বয়োধর্ম্মের অনুপাতে যতটা সম্ভব সাত্ত্বিকভাবে খাওয়া-পরার নিয়ম পালন ক'রে সেইভাবেই চলছে সে।

এর ঠিক বিপরীত প্যামেলা।

অমলেন্দুর বড় ভাই বিমলেন্দু মার আদেশ লঙ্ঘন করতে না পেরে বিবাহ করেছিলেন একটি পল্লী-বালিকাকে। দুঃখ এই যে, সেই মেয়েটিকে তিনি কিছুতেই নিজের মতে আনতে পারেননি। প্যামেলার মা উমাদেবী 'মিসেস্ গাঙ্গুলী' নামে পরিচিতা হন্‌নি, তিনি ছিলেন সকলের মা।

প্রথমে মিষ্টিকথায় উপদেশ, পরে নিগ্রহ, তারপর অনেক যাতনা দিয়েও বিমলেন্দু নিজের স্ত্রীকে তাঁর আদর্শে গ'ড়ে তুলতে পারেননি। নিজের পরিচিত অন্তঃপুর ছেড়ে উমাদেবী কোনো দিনই যান্‌নি কোনো ক্লাবে বা স্বামীর কোনো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিশতে।

স্ত্রীকে আয়ত্তের মধ্যে আনতে না পেরে দুঃখে ও রাগে মিঃ গাঙ্গুলী তাঁর একমাত্র মেয়েকে নিজের আদর্শে গ'ড়ে তোলবার জন্যে মায়ের কাছ-ছাড়া ক'রে, ইওরোপীয়ান্-বান্ধবী মিস্ সিমসনের কাছে রেখে দিয়েছেন 'কন্‌ভেন্ট'-এ তাঁর জিম্মায়। এতদিন সে তাঁদের শিক্ষায় শিক্ষিতা হবার পর এবার বিলেত যাবে, গাঙ্গুলীসাহেব তার 'পাসপোর্ট'-এর ব্যবস্থা করছেন।

সেই খবরটা দেবার জন্যেই প্রায় দু-হপ্তা পরে সেদিন প্যামেলা এলো, কিন্তু ঘরে ঢুকেই কি হলো কে জানে, শুভ্রজাকে সে অন্য কথা জিগেস করলে, বললে, "কেমন আছো, শু? তোমার বন্ধু সুব্রতবাবুর খবর কি? চাকরি পাবার পর

এখন তিনি নিশ্চয় খোশমেজাজে আছেন…আমি আশা ক'রে আসছি, এসেই দেখবো আমার বিদুষী বৈষ্ণবী-বোন্‌টি পিয়ানোর সুরে গলা মিলিয়ে কীর্ত্তন গাইছে আর তার কলেজ-বন্ধু সেতারের তারের ঝঙ্কারের ভেতর দিয়ে খোলের বোল্ তোলবার সাধনায় সেই কলেজ-ফাংসানের মতোই তন্ময় হয়ে আছেন। সত্যি শুভ্রজা, আমার এই কল্পনাটা যদি বাস্তবে রূপ নিতো, তাহলে তোমার এই তাপসী-জীবনযাত্রার মরু-পথে অন্তত একটা মরূদ্যানও দেখতে পেতে তুমি। বয়েসেরও তো একটা ধর্ম্ম আছে!"…

মুখরা এই বোন্‌টিকে বেশ ভালো করেই চেনে শুভ্রজা, তাই ওর বিদ্রূপের কোনো জবাব না দিয়ে গম্ভীর হয়ে ব'সে রইলো।

ওকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে প্যামেলা বললে, "বাড়ীতে মানুষ এলে তাকে খাতির করতে হয়। অমন বোবার মতো ব'সে থেকে তার অপমান করতে নেই—বুঝলে? যা হয় একটা কিছু বলো!"

শুভ্রজা বললে, "যা হয় কেন, সুব্রতবাবুর কথাই বলবো তোমায়, যাঁকে দেখবার আশা ক'রে আজ তুমি এসেছো এখানে। অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মনের পরিবর্ত্তন হয়ে এখন তাঁর ইচ্ছে হয়েছে, 'কন্‌ভেণ্ট'-এর ফেরত গাউন-পরা মেমেদের মতো একটি বাঙালী-মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী করবার। হাজারের মধ্যে একজন শিক্ষিত সুপুরুষ সুব্রতবাবুকে সত্যিই কি তুমি মনোনয়নে পছন্দ ক'রে এরকম কল্পনা করেছো নাকি?"

মুখের মত পাল্টা জবাব পেয়ে ইংরেজী-আদর্শে-গড়া প্যামেলা মাথা নীচু ক'রে মনে-মনে দিদিমণির কাছে পরাজয় স্বীকার ক'রে ভাবলে, যে গভীর জ্ঞানের চর্চ্চায় যে আশ্রয়ে লালিত হচ্ছে ও, সেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিজ্ঞানের ছাত্রী হয়ে এরকম পরিহাস করা মোটেই উচিত হয়নি ওর।

আজ প্রথম দেখলে শুভ্রজা, সদা হাস্যচঞ্চলা প্যামেলার চোখের কোলে জল টল্‌টল্‌ করছে।

প্যামেলা চলে যাবার পর নির্জ্জন ঘরে ব'সে শুভ্রজার মনে হলো, ছি ছি, শিক্ষিতা মেয়ে হয়েও এ কি অসঙ্গত কথা ব'লে গেল আজ প্যামেলা। আমার মুখে-চোখে এমন কি ভাবান্তর লক্ষ্য করলে সে যে তাতে হঠাৎ সুব্রতবাবুর প্রসঙ্গ উঠতে পারে। সুব্রতবাবু আমার এক দুর্দ্দিনে উপকার ক'রে আমায় রক্ষা করেছিলেন, তাই তাঁর প্রত্যুপকারের প্রত্যাশায় বাবাকে ব'লে, জেঠামণিকে অনুরোধ ক'রে সে তাঁর একটা চাকরি পাবার সাহায্য করেছে, মানুষ মাত্রেরই যা করা উচিত।

এরপর দেড়মাস কেটে গেছে। প্যামেলা সেই যে চলে গেছে, তারপর আসেনি আর। সে না এলেও, নিরালা-অবসরে রোজই শুভ্রজা প্যামেলার সেই কথাটা তোলাপাড়া

করে নিজের মনে। এর মাঝে একদিন একটা অঘটন ঘটে গেল। জেঠামণি মিঃ গাঙ্গুলীসাহেব হঠাৎ এসে ওর কাছে জানালেন, প্যামেলা তাঁর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে তাঁকে কিছু না জানিয়ে মেমসাহেবের সঙ্গে শিলং চলে গেছে এবং লোক-পরম্পরায় তিনি শুনেছেন, সে নাকি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করবে। তুমি এখুনি চ'লে যাও 'কন্‌ভেণ্ট'-এ, গিয়ে আসল খবরটা জেনে, ফেরবার পথে আমার সঙ্গে বাড়ীতে দেখা ক'রে জানিয়ে আসবে যে, কথাটা সত্যি কি না।" ব'লে মিঃ গাঙ্গুলী চলে গেলেন, শুভ্রজা আর দেরী না ক'রে—অফিস থেকে সেন-সাহেবের ফেরবার অনেক দেরী আছে বুঝে ওদের আর-একখানা গাড়ীতে উঠে চলে গেল বরাবর 'কন্‌ভেণ্ট'-এর উদ্দেশে।

সেখানে গিয়ে প্রিন্সিপ্যাল মিস্ সিমসনের মুখে যা শুনলে তাতে ওর ধৈর্য্যচ্যুতি হলো। তিনি বললেন, "ওয়েল্ শুভ্রজা, বোনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছো? যাও যাও, তোমার আর কার্ডের দরকার নেই। গত-কাল রাত্রে আমরা শিলং থেকে ফিরেছি। এতদিন পরে ওর সুমতি হয়েছে—ঈশ্বরের দয়ায়, করুণাবান্ যীশুর উপদেশ মেনে নিয়ে প্যামেলা এবার আমাদেরই একজন হতে চলেছে।"

শুভ্রজা আকাশ থেকে পড়ে—"এ-কথার মানে? প্যামেলা আপনাদের একজন হতে চলেছে এর অর্থ তো কিছু বুঝলেম না সিস্টার—"

"ও মাই হেভেন্! প্যামেলা তোমায় কিছু জানায়নি বুঝি? এ-কথা সে তো তার বাবাকে জানিয়েছে, তাই তো তিনি প্যামেলার সব খরচ-দেয়া বন্ধ করেছেন, নিজে না এসে লোক দ্বারা জানিয়েছেন, প্যামেলার সঙ্গে তাঁর আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না যদি সে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে। এ অন্যায়··· খুবই অন্যায়। তাই যদি তাঁর মনে ছিল তাহলে আমার হাতে মেয়ের শিক্ষার ভার দিয়ে তাঁর মতো জ্ঞানীলোকের এ ছেলে-মানুষী করা মোটেই উচিত হয়নি।"

নিজেকে সংযত ক'রে বুদ্ধিমতী শুভ্রজা বললে, "ও, এই জন্যে যদি খরচ দেয়া বন্ধ ক'রে রাগ ক'রে থাকেন তো অন্যায়ই বলতে হবে। প্যামেলার সঙ্গে আমার অনেকদিন দেখা হয়নি। আচ্ছা ধন্যবাদ, প্যামেলার সঙ্গে দেখা করলেই সব বুঝতে পারবো—সে এখন তার ঘরে আছে নিশ্চয়?"

"হ্যাঁ, যাও।" ব'লে মিস্ সিমসন নীচে নেমে গেলেন, শুভ্রজা চললো প্যামেলার ঘরের দিকে।

ঘরের দরজার পরদার বাইরে দাঁড়িয়ে শুভ্রজা আর-একটি যে নারীর কণ্ঠস্বর শুনলে, মনে হলো সে-স্বর ওর চিরদিনের পরিচিত। সেখান থেকেই মৃদুকণ্ঠে শুভ্রজা জানালে, "আমি এসিছি, প্যামেলা।" ···বলতে-বলতে দরজার পরদা সরিয়ে যাকে সেখানে দেখলে, তাঁকে সেখানে সেই অবস্থায় দেখার কল্পনাও ও করতে পারেনি। তাছাড়া ওর তখন এমন অবস্থা হলো যে, সেখান থেকে এক-পাও আর পেছনে ফিরতে পারলে না।

কারণ তিনি ওর মা। ওর দাম্ভিকা গর্ভধারিণী মা ব'সে আছেন প্যামেলার সামনে মুখোমুখী হয়ে।

অবাকবিস্ময়ে এক-পলকে দেখে নেয় শুভ্রজা ওর মাকে—দেশী শাড়ি-ব্লাউজে সজ্জিতা একটি খাঁটি মেমসাহেব যেন।··· চিত্রিত ভ্রূ ওষ্ঠ গণ্ড মায় নখ পর্য্যন্ত যেন—নকল-রূপের বিচারে মিথ্যে-সাক্ষী ধরা প'ড়ে স্বরূপ প্রকাশের আতঙ্কে সিঁটকে আছে। ···দেখে বেদনায় টন্‌টন্ ক'রে ওঠে ওর বুক···দারুণ বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে নেয় শুভ্রজা।

মিসেস্ গাঙ্গুলীও ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে তাকিয়ে থাকেন মেয়ের দিকে।···আট বছর পরে হঠাৎ দেখে একে যেন ঠিক চিনতে পারেন না। সর্ব্বআভরণত্যক্তা শুভ্র ধুতিপরিহিতা এই কি তাঁর মেয়ে শুভ্রজা, যার মুখ দেখা তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে এড়িয়ে এসেছেন ?

শশব্যস্ত হয়ে উঠে প্যামেলা বললে, "এসো শুভ্রজা, বোসো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।" ব'লে ওর হাত ধ'রে নিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলে।

মিসেস্ গাঙ্গুলী চাপা-গলায় বললেন, "আজ আমি উঠলেম প্যামেলা, আমার মাথা ঘুরছে।"

ব'লে আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না ক'রে তিনি উঠে এগিয়ে চললেন দেখে প্যামেলা বললে, "আপনি কি খুব অসুস্থ বোধ করছেন ছোট মা ? মাথার যন্ত্রণা যদি খুব বেড়ে

থাকে তাহলে একটু ব'সে যান···একটা 'সারিডন' খেয়ে একটু সুস্থ হবার পর যাবেন না হয়।"

সে-কথা না শুনে মিসেস্ গাঙ্গুলী এগিয়ে গিয়েও যেতে পারলেন না, বারান্দার রেলিংয়ের ওপর মাথাটা রেখে দাঁড়ালেন ···রুদ্ধ রোদনাবেগে তাঁর দেহটা তখন কেঁপে-কেঁপে উঠছে···

মা। শুভ্রজার মা। প্যামেলা ভাবলে, তারও তো মা আছে। শুভ্রজার মা আর তার মা—কি অদ্ভুত ব্যতিক্রম? ওই মায়ের মেয়ে শুভ্রজা একেবারে মায়ের বিপরীত। মা বর্ত্তমান স্রোতে ভেসে চলেছেন শুধু ক্লাব-ডিনার-টিপার্টি-নাচগান এইসব নিয়ে, আর ওঁর মেয়ে শুভ্রজা—সে যেন একটি সদ্য-ফোটা জুঁইফুল···এককোণে আত্মগোপন ক'রে করছে জ্ঞানের সাধনা···সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক সে···কেউ তার নাগাল পাবে না—সে সকলের বাইরে।

আর প্যামেলার মা? তাঁর মুখ মনে পড়ে প্যামেলার—লালপাড় গরদের শাড়িখানা তাঁর কমদেহ বেষ্টন ক'রে আছে···সিঁথিতে উজ্জ্বল সিঁদুর···কপালে লাল সিঁদুরের ফোঁটা জ্বলছে দপ্‌দপ্‌ ক'রে···মায়ের হাতে শাঁখা, পায়ে আলতা··· সেই পাদুকাবিহীন রিক্ত পা-দু'খানি দেখলে, সকালে-ফোটা স্থলপদ্ম ব'লে ভ্রম হবে সকলের—

সেই মায়ের মেয়ে প্যামেলা।

কে কি চেয়েছিল, কে কি পেলে না···কে কত আশা করেছিল, কার আশাকুসুম অঙ্কুরেই শুকিয়ে গেল? সে হতে

পারতো মণিকা গাঙ্গুলীর মেয়ে···শুভ্রজা হতে পারতো উমাদেবীর সন্তান, তবেই-না সব দিকে সামঞ্জস্য রক্ষা হতো? কিন্তু নিয়তির লীলাচক্রের আবর্ত্তনে কে কার মনোবৃত্তি পেলে···কে টিকে রইলো, কে ভেসে গেল কালের স্রোতে বিলীন হয়ে?···

প্যামেলা বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখলে, মিসেস্ গাঙ্গুলী চলে গেছেন সেখান থেকে।

ঘরের মধ্যে যেতে পারে না প্যামেলা, ভাবে, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করবার জন্যে সিসটারের এই যে এত পেড়াপীড়ি, কি ধর্ম্ম ত্যাগ করবে সে, আর কোন্ ধর্ম্মই-বা গ্রহণ করবে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে কি জানে সে? চিরদিন নাস্তিক—বিজ্ঞানের ছাত্রী সে, বিজ্ঞানকেই বরাবর শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়ে এসেছে। তবে? কাকীমা মণিকা গাঙ্গুলী এসেছেন খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করবার জন্যে তাকে উৎসাহিত করতে, শুভ্রজা নিশ্চয়ই এসেছে তিরস্কার করতে। কিন্তু এ-অবস্থায় তার করণীয় কি, ভালো ক'রে না ভেবে কাউকেই আজ সে পাকা কথা দিতে পারে না।···

শুভ্রজা এসে পেছনে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধের ওপর হাত দিয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকলে, "প্যামেলা!"

ওর দিকে ফিরে ম্লান হেসে প্যামেলা বললে, "তুমি যা বলতে এসেছো শুভ্রজা, আমি জানি। কিন্তু আজ আমি কোনো কথাই বলতে পারবো না সে-সম্বন্ধে, কারণ নিজেই এখনো নিশ্চিত হইনি যে কি করবো আমি। অনেক কথাই তোমায় বলবার ছিল, বলতুমও, কিন্তু না। কিছু মনে না

ক'রে আজ তুমি বাড়ী যাও ভাই, আজ আমি বড় ক্লান্ত, আমায় একটু ভাবতে দাও···বিশ্রাম করতে দাও একটু। তবে তোমায় আমি কথা দিচ্ছি, যা করবো, তোমায় না জানিয়ে করবো না।" ব'লে চলে গেল প্যামেলা তার ঘরের দিকে।

শান্ত হাসি ফুটে উঠলো শুভ্রজার মুখে।

চিরদিনের চঞ্চল উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতির মেয়ে প্যামেলা ছুটেই চলেছে, কোথাও দাঁড়াতে পারে না···ভাবতে পারে না এতটুকু। আজ নিশ্চয়ই বিপরীত ধাক্কা এসে লেগেছে বুকে তাই মুষড়ে পড়েছে এত। তাই হোক্, ভেবেই ও ঠিক করুক এ-অবস্থায় ওর কর্ত্তব্য কি···ওর সুমতি ওকে পথ দেখিয়ে দিক্, কোন্ দিকে গেলে জীবনে ও সুখী হবে।

শুভ্রজা আর দাঁড়ালো না সেখানে।

*

*

ফেরার পথে উদ্বিগ্ন জেঠামণিকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে তাঁর বাড়ীতে এসে জানালে শুভ্রজা, অত উতলা হবার কারণ নেই, গত-কাল প্যামেলা ফিরেছে শিলং থেকে এবং ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করার জন্যে মিস্ সিমসনের দারুণ আগ্রহ সত্ত্বেও সে এখনো মন স্থির করতে পারেনি যে কি করবে। তবে যাই করুক না কেন, তার আগে আমায় জানাবে বলেছে।"

জেঠামণি বিমলেন্দু বললেন, "ও-কথা কথাই নয়। 'কনভেণ্ট'-এর লোকেরা ছাড়বেন কেন? তাঁরা তো কোনো অন্যায় কাজ করছেন না, আর কোনোরকম পাপ কাজ করবার জন্যেও জুলুম করছেন না কাউকে। অন্য ধর্ম্ম ছেড়ে শুধু তাঁদের ধর্ম্মে নিয়ে যেতে চাইছেন তাঁরা। এতে আর দোষ কি? আমিও জানি, ঈশ্বর এক। ধরো—লক্ষ্যস্থান যদি তোমার 'গড়ের মাঠ' হয়, যে অলি-গলি দিয়েই যাও না কেন, গড়ের মাঠে পৌঁছোতে পারলেই তোমার কার্য্যসিদ্ধি হলো। কিন্তু পরিচিত পথ তোমার যত সঙ্কীর্ণ ই হোক্, সে পথ ছেড়ে তুমি জনাকীর্ণ রাজপথ দিয়েই-বা যেতে যাবে কেন?"

শুনে শুভ্রজা একটু হাসলে, বুঝলে, জেঠামণির মন এখনো সেই ইংরেজী-ভাবেই ভ'রে আছে তাই হিন্দুধর্ম্মের পথটা সঙ্কেতে 'সঙ্কীর্ণ' ব'লে উল্লেখ করলেন।

একদিকে সাহেব-ঘেঁষা মন, অন্যদিকে স্নেহের সন্তানের আকর্ষণ—তাকে হারাবার আশঙ্কা। দু-নৌকোয় পা দিয়ে এবার কি বিপদেই যে পড়েছেন উনি…সত্যি, জেঠামণিকে দেখলে এখন মায়া হয়…ভগবান ওঁর আশা পূর্ণ করুন, তাছাড়া এখন আর কি প্রার্থনা করবে শুভ্রজা।

এইসময় ফোনের সাড়া পেয়ে রিসিভারটা কানে নিয়েই গাঙ্গুলীসাহেব বললেন, "ইয়েস্, ডবল-টু ডবল-থ্রী, ওয়ান্ এইট্… হু ইউ প্লিজ?"

ফোনের ওপার থেকে বাংলায় জবাব এলো, "আমি এলগিন রোড থেকে বলছি···সাহেব বাড়ী আছেন ?"

গাঙ্গুলীসাহেব বললেন, "হ্যাঁ, আমিই। কাকে চান আপনি ?"

"আজ্ঞে, আমায় 'আপনি' বলবেন না সার্, আমি মতিলাল, সেন-সাহেবের বাড়ী থেকে ফোন্ করছি। আজ দুপুরে আপনি চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে দিদিমণি গেছেন 'কনভেণ্ট'-এ প্যামেলা-দিদিমণির সঙ্গে দেখা করতে। ব'লে গেছেন, ফিরতে তাঁর দেরী হতে পারে, কারণ আপনার বাড়ীতে আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে ফিরবেন তিনি। আমাদের সাহেব এইমাত্র বাড়ীতে এসেই দিদিমণিকে তলব করলেন তাই জানিয়ে রাখছি, তিনি এলেই দয়া ক'রে এখুনি পাঠিয়ে দেবেন। সাহেব একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন কিনা—"

"সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ?··· কিরকম অসুস্থ ?··· যাবো নাকি আমি এখুনি, মতি ?" দারুণ আগ্রহাতিশয্যে মিঃ গাঙ্গুলী ভুলে গেলেন বলতে যে, শুভ্রজা এসেছে এবং এখানেই ব'সে আছে।

মতিলাল বললে, "আজ্ঞে, আপনি আসতে চাইলে কে আর নিষেধ করবে সার্ ? তবে তেমন কিছু নয়, বললেন, মাথাটা খুব ধরেছে তাঁর···"

এপারের ছিন্ন-কথাগুলোর-মধ্যে 'অসুস্থ' আর 'মতি' শব্দটা জেঠামণির মুখে শুনেই তাঁর কাছ থেকে রিসিভারটা চেয়ে

নিয়ে শুভ্রজা বললে, "কে—মতি? কি হয়েছে বাবার?...
আচ্ছা যাই হোক্, আমি এখুনি যাচ্ছি, শুধু যেতে যতটুকু
সময় লাগে।" বলেই ফোন্ ছেড়ে দিয়ে, জেঠামণির পায়ে
হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে বেরুবার সময় ব'লে গেল, আমি
গিয়েই রিং করবো আপনাকে তিনি কেমন থাকেন।"

আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে চোখ বুঁজে শুয়ে আছেন
সেনসাহেব। মাথায় অডি-কলোনের পটি, পাশে চলছে
টেবলফ্যান, মতিলাল নতজানু হয়ে ব'সে পায়ে হাত বুলোচ্ছে
সাহেবের। ডাক্তার আর. দাশ. তাঁর বাঁ-হাতের রিষ্টওয়াচের
কাঁটার দিকে দৃষ্টি রেখে, ডান-হাতে সাহেবের নাড়ীর 'বিট্'
পরীক্ষা করছেন। পরে জানা গেল, মাথার যন্ত্রণা বেশী
হতেই বাড়ীতে আসবার আগে অফিস থেকে মিঃ সেন
ফোন্ ক'রে এসেছিলেন তাঁর ফ্যামিলি-ফিজিসিয়ান ডাক্তার
রণধীর-সাহেবকে।

শুভ্রজা ঘরে ঢুকে ডাক্তারসাহেবকে নমস্কার জানাবার পর
মাথা নুইয়ে প্রত্যভিবাদন জানালেন তিনি, তারপর সবাই
চুপ।

হঠাৎ এমন কি হলো যাতে ডাক্তার আসার প্রয়োজন
হয়েছে বুঝতে পারে না শুভ্রজা, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে
একপাশে মিঃ সেনের আর ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে।

কাজ শেষ ক'রে ডাক্তারসাহেব প্রেস্‌ক্রিপসন্ লেখবার

পর বললেন, "না, বিশেষ কিছু নয়, বেশী কাজের চাপ আর 'প্রেসার'টা সামান্য বেড়েছে, তাই। কাজের মানুষ তো? আগে থেকেই সাবধান হয়েছেন। ভালোই হয়েছে। এখন একটু তন্দ্রার ভাব আছে, যদি ঘুমিয়ে পড়েন তো, জাগলে পাউডার এক পুরিয়া খাইয়ে দেবেন···লম্বা একটা ঘুম হয়ে যাবে। ঘরে নিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রে কেউ 'ডিষ্টার্ব' করবেন না, এই ইজি-চেয়ারেই বিশ্রাম করতে দেবেন। ভয়ের কারণ কিছু নেই, খানিক ঘুমুলেই সেরে যাবেন।"

ডাক্তারসাহেব চলে গেলেন।

বড়লোকের কাণ্ড। কাণ্ডই-বা বলি কেন।···হাজার লোকের রোজগার যিনি একা করতে পারেন দু-হাতে, সামান্য মাথা-ধরাতেও তাঁর অসামান্য খরচ না হ'লে দেশের আর-পাঁচজনের চলবে কিসে? অপরের সামান্য প্রয়োজনেও বেগার দেবার জন্যে কেউ ব'সে নেই কলকাতা শহরে।

তন্দ্রাচ্ছন্নের মত চোখ বুঁজে শুয়ে আছেন মিঃ সেন।

সতর্কদৃষ্টিতে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে মতিলাল, একবার চোখ চাইলেই পুরিয়াটা খাইয়ে দেবে। টিপয়ে সাজানো রয়েছে—ফিডিংকাপ, 'ভিক্স্', কার্বা-ভরা গোলাপজল, ওষুধের পুরিয়া আর যতই টেবল-শিলিংফ্যান্ চলুক না কেন, ঝালর-দেয়া বাহারি হাতপাখা একখানা।

দেখে শুভ্রজা বাথরুমে ঢুকলো সারা-দুপুরের শ্রমশ্রান্ত দেহটাকে স্নান ক'রে শীতল ক'রে নেবার জন্যে।

এইসময় সাহেবকে একটা 'হাই' তুলতে দেখেই মতিলাল চাপা-গলায় ফিস্-ফিস্ ক'রে জানালে, এক পুরিয়া পাউডার খাওয়াবে সে, সার্ যদি—"

সাড়া না দিয়ে চোখ বুঁজেই মিঃ সেন হাঁ করলেন, মতিলাল খাইয়ে দিলে ওষুধটা।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে কাপড় ছেড়ে এসে নিজের ঘরে ব'সে জেঠামণিকে ফোন্ ক'রে রিসিভারটা নামিয়ে রাখবে শুভ্রজা, এমন সময় বারান্দার জোর-আলোয় মানুষের একটা ছায়া ঘরে পড়তেই ব'লে উঠলো—"কে ?"

"আমি হরিচরণ···একটা খবর আছে দিদিমণি।"

"ভেতরে এসো।"

ঘুরে ঢুকে হরিচরণ টেবলের ওপর একটা 'ভিজিটিং কার্ড' রেখে বললে, "একজন সাহেব-বাবু এসে দেখা করতে চাইছেন আমাদের সাহেবের সঙ্গে কি আপনার সঙ্গে ঠিক বুঝতে পারলাম না—কি বলবো তাঁকে ?"

কার্ডে-ছাপা নামটা প'ড়ে শুভ্রজা বললে, "নিয়ে এসো তাঁকে।"

হরিচরণ চলে যেতেই—কোনোদিন যা করে না শুভ্রজা··· শুধু সকাল থেকে এখন পর্য্যন্ত যেসব অবাঞ্ছিত আবহের মধ্যে কেটেছে ওর আজ, তার দরুন মুখখানা খুব ক্লিষ্ট বা কোনো-রকম ব্যাকুলতার কুঞ্চন-রেখা পড়েছে কিনা কপালে দেখবার

জন্যে চেয়ার থেকে উঠে আয়নায় একবার মুখখানা দেখে নিয়ে এসে আবার বসলো চেয়ারে।

আগন্তুক বাঙালী-সাহেবটি ঘরে ঢুকেই কপালে হাত তুলে বললে, "নমস্কার শুভ্রজাদেবী।"

একটুও অধীরতার ভাব প্রকাশ না ক'রে, টেবলের এ-পাশের চেয়ারখানা হাত দিয়ে দেখিয়ে শুভ্রজা বললে, "বসুন।"

নবাগত অতিথি চেয়ারে বসবার আগেই বললে, "অবরে-সবরে কাজের তাগিদে যেতে হয় আমায় গাঙ্গুলীসাহেবের কাছে। কিছুক্ষণ আগে তাঁর কাছে গিয়ে শুনলুম, মিঃ সেন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাই একবার—"

"ভালোই তো করেছেন এসে। কিন্তু দেখা তো হবে না এখন তার সঙ্গে··· এইমাত্র ওষুধ খেয়ে তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন বহুক্ষণ যন্ত্রণা ভোগ করবার পর। তা হোক্, আমি জানাবো তাঁকে আপনার আসার কথা তিনি উঠলে। ···তারপর, কেমন আছেন?"

"ভালো থাকবারই তো কথা আপনার শুভেচ্ছায়, কিন্তু পাড়াগাঁর মানুষ, একটা পিছটান আছে তো দেশের দিকে? চলে আসবার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত কোনো খবর নিতেও পারিনি, আর ইচ্ছে করেই কোনো খবর দেয়া হয়নি তাঁদের—"

"সব শুনেছি আমি মতির মুখে। প্রায়ই তো সে যায় আপনার কাছে··· যা শুনে আসে কিছু গোপন করে না

আমায়। বড় দুঃখ হয় আপনার জন্যে। সেই মানুষ কি ক'রে যে এমন হয়ে গেলেন···”

স্মিতহাসি হেসে সুব্রত বললে, “দরিদ্রতাকেও তো তার প্রাপ্য সম্মান দিতে হবে। যার অসাধারণ শক্তিতে চিরদিনের নাস্তিক আস্তিক হয়—চোখের জলে ভিজে ভগবানকে ডাকতে পারে আকুল হয়ে, তার পূজার অর্ঘ্য ষোড়শোপচারে দিতে হবে বৈকি। আমার মত দরিদ্রের পক্ষে দুঃখ পাওয়াটা খুব বড় দুঃখ নয়। কিন্তু এত সুখের মধ্যে লালিত হয়েও আপনার স্বাস্থ্য আর রূপের যে কি পরিবর্ত্তন হয়েছে, দেখেছেন কোনোদিন আরশিতে? সেদিনেও যা দেখে গেছি আমি··· সত্যি শুভ্রজাদেবী, আপনার ঐ শুচিশুভ্র পবিত্র মুখে কে যেন 'ট্রান্সপেরেণ্ট ভায়োলেট কলার'-এর হাল্কা একটা ছোপ্ লাগিয়ে দিয়েছে।”

অধরোষ্ঠের মাঝে তির্য্যক-রেখায় একটা মৃদুহাসি টেনে শুভ্রজা বললে, “রূপ? রূপটা তো আর 'কোয়ালিফিকেশন্' নয়—'অ্যাসেট'। জন্মাবার সময়েই মানুষ সেটা সঙ্গে নিয়ে আসে পৃথিবীতে। কিন্তু জ্ঞান হবার পর যা আয়ত্তে আনতে হয়, সেই 'সুপথ' আর 'কুপথ' বেছে নিতে হয় মানুষকে জ্ঞানার্জ্জনের সাধনার ভেতর দিয়ে। আমার পথ আমি বেছে নিয়েছি। একদিন বিপদের এক সঙ্গিণ মুহূর্ত্তে আপনার মনুষ্যত্বের পরিচয় পেয়েছিলেম তাই এই নির্জ্জন ঘরে এতক্ষণ ব'সে আমার পক্ষে যা শোনা অনুচিত সেই 'রূপ'-এর আলোচনায় কাটিয়ে

দিলেম। আমি যে ব্রত নিয়েছি, যে আচার-অনুষ্ঠান চিরদিন পালন ক'রে যাবার দৃঢ়সঙ্কল্পে মন বেঁধেছি তাতে আমার পক্ষে ওসব আলোচনার প্রসঙ্গ কানে শোনাও পাপ।"

লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে সুব্রত বললে, "আমার ইচ্ছাকৃত না হলেও এটা অপরাধের পর্য্যায়ে পড়ে এখন বুঝছি। আমি বলতে চেয়েছিলুম যে-কথা সেটা হয়তো ঠিক আপনার বোধগম্য হয়নি, বা আমিই ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারিনি, তার জন্যে আমায় ক্ষমা করবেন। আপনার উক্তিটাই আমি বলতে গিয়ে বেকুব হয়ে গেলুম। যাক্, তার জন্যে দুঃখ নেই। দুঃখ সয়ে-সয়ে এমন গা-সওয়া হয়ে গেছে, যে, কোনো দুঃখই আর আমায় পীড়া দিতে পারে না। কিন্তু ভাগ্যদোষে আজকের এ-প্রসঙ্গ—বড় অন্যায় শুভ্রজাদেবী, খুবই অন্যায় ক'রে ফেলিছি আমি। আচ্ছা, দয়া ক'রে একবার খবর নিন্, মিঃ সেন জেগেছেন কি না, আর তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ যদি এখন না হয় তো কখন এসে তাঁর কাছে নতজানু হয়ে আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন ক'রে যেতে পারবো।"

এবার শুভ্রজার মনের গতি মোড় ফিরলো যেন। বললে, "আপনাকে পীড়া দেবার মতো কোনো কথাই বলিনি আমি। আমি বলিছি শুধু আমার কথা। তার জন্যে ক্ষমা চেয়ে আমায় লজ্জা দেবেন না সুব্রতবাবু! আচ্ছা বসুন একটু, আমিই দেখে আসছি বাবা কি অবস্থায় আছেন এখন।"

শুভ্রজা চলে গেল ঘর থেকে।

মতিলালের নির্দ্দেশমত চারদিকের দেয়ালের কোথাও দেখতে পেলে না সুব্রত, শুভ্রজার স্বর্গত-স্বামীর 'পোর্ট্রেট'খানা।

তখুনি শুভ্রজা এসে জানালে, অন্তত দু'ঘণ্টার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা হবার আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু এখন একটা অনুরোধ আমার রাখতে হবে আপনাকে। বাড়ীতে অতিথি এসে ফিরে যাবে বাড়ীর মালিক অসুস্থ ব'লে, এ হতে পারে না। বিশেষ কিছু নয়, সামান্য এক কাপ চা খেয়ে এ-বাড়ীর মালিকের কল্যাণ কামনা ক'রে যাবেন এইটুকুই আপনার কাছ থেকে আশা করছি আমি।"

শুভ্রজার এ নম্র-অনুরোধ সুব্রত উপেক্ষা করতে পারলে না। ভাবলে, তবু যতটুকু সময় উপকারী-বান্ধবীর সাহচর্য্যে থেকে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানানো যায়···হ্যাঁ, শুধু কৃতজ্ঞতাই। মহীয়সী ব্রহ্মচারিণী শুভ্রজাদেবী। কি সরল! কি সুন্দর!···

সুব্রতকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে শুভ্রজা বললে, "যখন বলার কথা সব ফুরিয়ে যায় আর সময় থাকে অল্প, তখন অনধিকার চর্চ্চা ক'রে সেই সময়টুকুর অপব্যবহার করতে দেখেছি অনেক সময় অনেককে। আমারো হয়েছে তাই। চা অবশ্য এখুনি এসে যাবে, সেই ফাঁকে আমি একটা কথা জিগেস করছি, একটু আগে আপনি বলেছেন, দেশের দিকে আপনার পিছটান আছে। হয়তো আছে, কিন্তু তার জন্যে আপনার অন্তরের টান আছে ব'লে তো কিছু বুঝতে পারলেম না। যে আশায় আপনার বাবা শিশুকাল হতে লালন

ক'রে আপনাকে আজ জগতের মধ্যে যশস্বী হবার সুযোগ এনে দিয়েছেন, তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো কৈ! আপনি তাঁর কৃতী সন্তান···বাপের বুকভরা গর্ব্বের তুঙ্গশৃঙ্গ। আপনার কি উচিত তাঁর সেই গর্ব্বোন্নত বুকখানা ভেঙে চূর্ণ ক'রে দেয়া? আট-দশ হাজার টাকা আপনার পিতৃঋণ। চাকরির মাইনের টাকা জমিয়ে আপনি কতকাল পরে সে ঋণ শোধ করবেন? অথচ সে ঋণ শোধ করা আপনার পক্ষে এত সহজ যে, আপনি ইচ্ছে করলেই বাবাকে ঋণমুক্ত করতে পারেন। আশ্চর্য্য! আপনার বাবার বাল্যবন্ধু, দুর্দ্দিনে আপনাকেও যিনি প্রতিপালন ক'রে এসেছেন—শুধু বাবাকে অঋণী করা নয়, তাঁর প্রতিও তো আপনার মতো শিক্ষিত ছেলের কৃতজ্ঞতা জানাবার কিছু থাকবে। শুনলেম, তাঁর অনূঢ়া মেয়েটিকে আপনি বিবাহ করলেই বাবা আপনার ঋণমুক্ত হতে পারেন, আবার সে মেয়েটি নাকি অসামান্যা রূপসী। আপনি বলবেন সে উন্মাদ। তাতে আপনার কি আসে-যায়। তাকে রোগমুক্ত করবার জন্যে তার বাবার কুবের ভাণ্ডার তো সব-সময়েই উন্মুক্ত থাকবে। আমি ভেবে পাইনে যে আপনার সত্যিকারের উদ্দেশ্যটা কি।···দেশের বাড়ীতেও যাবেন না, বিয়েও করবেন না—সন্ন্যাস নেবেন নাকি?"

একটানা এত কথা কয়ে দম নেবার জন্যে শুভ্রজা এবার চুপ করলে।

হাসতে-হাসতে সুব্রত বললে, "আমরা তো সন্ন্যাসীরই জাত,

শুধু আপনাদের টানেই সংসারী—এই দেখুন, আবার একটা অপরাধ হয়ে গেল বোধ হয়। বিশ্বাস করুন শুভ্রজাদেবী, ঐ 'আপনাদের' শব্দটা 'স্লিপ' ক'রে বেরিয়ে গেছে মুখ থেকে—"

বাধা দিয়ে শুভ্রজা বললে "না না, ওর জন্যে আপনাকে অত সঙ্কুচিত হতে হবে না। অন্তত এ বুদ্ধি আমার আছে যে, 'আপনাদের' শব্দটা আপনি ব্যবহার করেছেন আমাকে 'মিন্' ক'রে নয়, আমার মাধ্যমে সব মেয়েদের কথা মনে করেই বলেছেন ও-কথাটা। ওটা কথার মাত্রা। তাছাড়া আপনি ও-কথার আগে 'আমরা' শব্দটাও তো প্রয়োগ করেছেন। যাক্, ওই চা এসে গেছে, কাজের মানুষ আপনি, বাজে-কথায় সময় নষ্ট না ক'রে এখন ওগুলোর সদ্ব্যবহার করুন··· আমিও এবার বাবার কাছে গিয়ে বসবো একটু।"

বয় এসে চা'র ট্রেতে আহার্য্য যা রেখে গেল খাবার টিপয়ে, দেখে সুব্রত বললে, "করেছেন কি? এ যে পাঁচজনের পেট ভ'রে খাওয়ার মতন। তাছাড়া, আপনার কৈ? আর এত 'ড্রাই' কি আমি খাই রোজ বোর্ডিং-এ?"

শুভ্রজা বললে, "এসব ব্যবস্থা করেছে মতিলাল ব'সে-ব'সে বাবুর্চীকে হুকুম দিয়ে। আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর—আমি চা খাইনে, দ্বিতীয়—মতিলালকে একদিন আপনি এখানে ব'লে গেছলেন, রাঁধতে আপনি মোটেই জানেন না, কেউ রেঁধে দিলে খেয়ে ভালো-মন্দ বিচার ক'রে বলতে পারেন শুধু। মতিকে চেনেন তো? হাতে পেয়ে বোধকরি শোধ নিচ্ছে

আপনার সেদিনের সে-কথার। আপনিই-বা তাকে ছাড়বেন কেন? খেয়ে ব'লে যাবেন কোন্‌টার কি স্বাদ…কোন্‌টা ভালো কোনটা মন্দ…নিন্, সুরু করুন আর দেরী করবেন না।"

খেতে-খেতে সুব্রত ভাবলে, আজ না হয় কারণ ছিল তাই ও আসবার সুযোগ পেয়েছে। আবার কিছুদিন 'গ্যাপ' না দিয়ে তো আর আসা যাবে না এখানে।…কি ভালো যে লাগলো শুভ্রজাদেবীর সঙ্গে এতক্ষণ কথা কয়ে। ইচ্ছে হচ্ছে রোজ অফিসের পর এখানে এসে ওঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা ব'লে তারপর মেসে যেতে। শুভ্রজাদেবী—দেবীই। ওঁকে পূজা করতে হয়—বর চাইবার আশা না ক'রে শুধু শুচিশুদ্ধ একাগ্রমনে পূজা…

খাওয়া শেষ ক'রে সুব্রত নমস্কার জানিয়ে চলে যাবার সময় চেয়ার থেকে উঠে প্রতিনমস্কার ক'রে শুভ্রজা বললে, "আজ যেজন্যে এসে এত কষ্ট পেয়ে গেলেন সে কাজ হলো না। আর-একদিন অতি অবশ্য এসে বাবার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন—ভুলবেন না।"

সুব্রত আর কথা বাড়ালে না। স্বীকৃতি জানিয়ে মনের আনন্দে চলে গেল ঘর থেকে।

…নানাভাবে চেষ্টা করেও সুব্রতবাবুকে বোঝা গেল না যে তাঁর আসল উদ্দেশ্যটা কি। শুভ্রজা ভাবলে, অগাধ টাকা পাবার আশা ত্যাগ ক'রে, অমন বাঞ্ছনীয় রূপসীর লোভ সম্বরণ ক'রে যে মানুষ উদাসীনের মতো নির্ব্বিকার থাকতে

পারে, নিশ্চয়ই তার মধ্যে কিছু গোপন-রহস্য আছে। ঠিক যেটুকু পেলে ওঁর পূর্ণ তৃপ্তি হয় সেটা হয়তো পাচ্ছেন না উনি। হয়তো—

কিন্তু একি দুর্ব্বলতা আমার মনের? সুব্রতবাবু আমার কে যে তাঁর জন্যে আমি ভাবতে যাবো! বোধ হয় উপকারী-বন্ধুর প্রতি সহৃদয়তা জানিয়ে তাঁকে তার স্বমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে মনের এ একটা উদগ্র আগ্রহ। দুরন্ত অসংযমী মন···

শুভ্রজা উঠে শ্বশুরের কাছে যাবার সময় পাশের ঘরে ওর স্বামীর ফোটোটা দেখেই মাথা নীচু করলে।···এক রকম চেহারার লোক অমন কত থাকে। সেই এক কথা নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা কি কোনো বিধবা-মেয়ের ভাবা উচিত? মনের রাস টেনে ধরলে শুভ্রজা।

*

* *

সেনসাহেবের বাড়ী থেকে বেরিয়ে চৌরঙ্গী-রোডে এসে বাসে ওঠবার সময় সুব্রতর মনে পড়লো ওকে একবার বৌবাজার-ষ্ট্রীটে 'গণেশ-জুয়েলারী'তে যেতে হবে। কিন্তু এখানেই তো রাত প্রায় আটটা। এখন গেলে কি আর খোলা পাবে দোকান? যাওয়া যাক্ তো। না পায়, ওখান থেকে পটলডাঙ্গা আর কতটুকু পথই-বা। নাহয় কাল সকালেই নেবে সিঁদুরকৌটোটা।

ছোট দোকান হোক্, 'গণেশ-জুয়েলারী' গয়নাও গড়ে ভালো আর বিশ্বাসী-হিসেবে নির্ভর করা যেতে পারে ওদের ফার্মকে···

সিঁদুরকৌটো।···দাদু অবলাবাবু বলেছিলেন, 'বড়লোক হয়েই আগে শুধবে আমার দেনা, তারপর অন্য আসবাবপত্র কেনা'। চাকরি ক'রে বড়লোক হওয়া এখন 'পরকা-কথা'—আসবাবপত্রের মধ্যে অফিসের পোষাক-তৈরী ছাড়া প্রথম মাসের মাইনে থেকে ও করেওনি কিছু। কিন্তু এ-মাসের মাইনের টাকা থেকে দাদুর নাতনী স্বর্ণলতাকে উপহার দেবার জন্যে সোনার এই সিঁদুর কৌটো যা 'সিলেক্ট' করেছে ও, এটা পেলে দাদুর কি আনন্দই যে হবে! বড় নাতনী স্বর্ণলতার সুখের জন্যে না করতে পারেন দাদু, এমন কিছু নেই দুনিয়ায়।

বিয়ের পর স্বর্ণলতা সুখী হয়নি, বাপের বাড়ীতে এলেই কান্নাকাটি করতো, সহ্য করতে না পেরেই তো দাদু বাড়ী-ছাড়া।···রাজবাড়ী-বোর্ডিংয়ের সেই খুপরিতে ঢুকে লুকিয়ে ব'সে আছেন এতদিন।

সোনার সিঁদুরকৌটোয় মিনার রঙিন্-অক্ষরে 'স্বর্ণলতা'র নামটা দেখে হেসে কুটিকুটি হবেন হাস্যার্ণব দাদু। তারপর সিঁদুর-ভর্ত্তি কৌটোটা খুলেই যখন দেখবেন তার মধ্যে সুব্রতর ঋণ-পরিশোধের একটা চক্‌চকে 'আধুলি' রয়েছে তখন তিনি···

সুব্রতর ভাগ্য ভালো তাই 'গণেশ-জুয়েলারী' তখনো খোলা ছিল। তাঁদের টাকা মিটিয়ে, কৌটোয় সিঁদুর ভর্ত্তি ক'রে

তার ওপর আধুলিটি রেখে পূর্ণ তৃপ্তি পাবার আনন্দে অধীর হয়ে সুব্রত তাড়াতাড়ি ফিরছে বোর্ডিংয়ে—দাছু ঘুমিয়ে পড়বার আগে।

বোর্ডিংয়ের সদরে ঢুকে হন্‌হন্‌ ক'রে সুব্রতকে চলে যেতে দেখে পাশের অফিস-ঘর থেকে ম্যানেজার বিমানবাবু তাড়াতাড়ি ডেকে বললেন, "ঘরে যাবার আগে একবার আমার কাছ থেকে হয়ে যাবেন সুব্রতবাবু, বিশেষ—"

"আসছি এখুনি সার্‌" ব'লে পকেট থেকে সিঁছুরকৌটোটা বের ক'রে হাতে নিয়ে হাসতে-হাসতে নিজের ঘরে ঢুকেই সুব্রত দেখলে…

কি দেখলে? দেখলে, পূর্ণিমার চাঁদে 'গ্রহণ' লেগেছে। ওকে দেখেই অবলাবাবু বালকের মত হাউ-হাউ ক'রে কাঁদতে-কাঁদতে থেমে-থেমে ভিজে-গলায় বলছেন, "আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।…সর্ব্বনাশ হয়েছে আমার, আর বাঁচবো না আমি। তোমার অপেক্ষাতেই ব'সে আছি ভাই—কি হবে আমার?"

সুব্রত বললে, "কি হয়েছে আপনার তাই বলুন আগে?"

দাছু হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলেন। সুব্রত দেখলে, খোলা একখানা 'টেলিগ্রাম' প'ড়ে আছে ওর বিছানার ওপর পাশের তক্তাপোশে। ক্ষিপ্র-হাতে টেলিগ্রামটা তুলে প'ড়ে সুব্রত বললে, "ও—এই? আমি মনে করলুম, কি-না-কি। তা, এর জন্যে এত আকুল হবার কি আছে?"

জোঁকের মুখে মুন পড়লো যেন। এক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে

থেকে দাদু বললেন, "আকুল হবো না—অ্যাঁ? ফুল-চন্দন পড়ুক তোমার মুখে। তুমি বলছো ওটা কিছু নয়?"

"কি আবার!" ব'লে একটু থেমে সুব্রত বললে, "ও জিনিসটাই ওইরকম। অফিসে আমার টেবলে একরাশ টেলিগ্রামের ভেতর থেকে এক-একখানার কভার ছিঁড়ে যখন পড়তে যাই, প্রতিবারই আমার মনে হয় এখানা নিশ্চয়ই অশুভ-বার্তা বয়ে এনেছে আমার বাবার কিংবা পিসীমার। তারপর খুলে দেখি, না। শুধু কাজের কথাই লেখা আছে তাতে। 'টেলিগ্রাম' জিনিসটাই এমনি ভয়াবহ। কিছু তো হয়নি, লেখা আছে—'স্বর্ণলতা'র শক্ত ব্যামো, শীগগির চলে আসুন আপনি।' এই তো। আপনার ভয়ে অসুখও হবে না নাকি কারুর?"

"তা বটে। কিন্তু আমি যাবো কেমন ক'রে? ভয়েই যে আমার হাত-পা সেঁধিয়ে গেছে পেটের ভেতর—কে নিয়ে যাবে আমায়?"

সুব্রত বললে, "আমি। আবার কে?"

এতক্ষণ পরে একটু স'রে এসে সুব্রতর গলাটা জড়িয়ে ধ'রে বৃদ্ধ এত বেশী চোখের জল ফেলতে লাগলেন যে, ওর গাল-গলা-মুখ সব ভিজে গিয়ে মনে হলো ও যেন লোনা-সমুদ্রের জলে ডুব দিয়েছে···

কিছুক্ষণ পরে বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে হাতঘড়িটা দেখে সুব্রত বললে, "এগারোটা বাজে। আজ রাত্রে আর ট্রেন নেই, তাছাড়া গুছোনোও হয়নি কিছু। কাল ফার্ষ্ট-ট্রেনেই রওনা

হয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবো আমি আপনাকে আপনার বাড়ীতে।”

“কাল সকালে ?···সকাল কখন হবে সুব্রত ?”

দুঃখের রাতগুলো কাটতে চায় না—এইরকমই মনে হয়। কিন্তু কান পেতে শোনো, ভোরের দিকে গড়িয়ে-পড়া লাস্যময়ী পৃথিবীর নূপুর-নিক্কণ শুনতে পাবে।

ভোরের 'রাণাঘাট-লোকাল্' ধ'রে নৈহাটি স্টেশনে পৌঁছোলেন যখন ওঁরা তখন বেলা বেশী হয়নি।

দাদুর বাড়ীর ফটকে এসে ট্যাক্সি থামতেই সুব্রত অবাক হয়ে গেল—এই দাদুর বাড়ী ? এ যে রাজপ্রাসাদ!

বাড়ীর কর্ত্তা এসে পড়েছেন···চাকর-দরোয়ান যারা সদরে ছিল তখন, মুখ-ধোয়া দাঁতন-করা ফেলে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে মোটঘাট নামিয়ে নিলে···ট্যাক্সির 'মিটার' দেখে ভাড়া মিটিয়ে সুব্রত পেছন ফিরে দেখলে, দাদু নেই।

কারুর অভ্যর্থনার অপেক্ষা না ক'রে দাদু তখন ধুঁকতে-ধুঁকতে মহল পার হচ্ছেন।

সুব্রতকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। দাদুর ছেলে নিজে এসে খাতির ক'রে ওকে ডেকে নিয়ে গেলেন, বৈঠকখানায় নয়—প্রথম দ্বিতীয় মহল পার হয়ে একেবারে তৃতীয় মহল—অন্দরের দিকে। দাদুর সখের নাতি সুব্রত,

এ-সম্পর্কের কথা কি আর না ব'লে পাঠিয়েছেন ছেলেকে অবলাবাবু?···

চক-মেলানো ভেতরবাড়ীর বারান্দা দিয়ে যেতে-যেতে দক্ষিণদিকের একটা ঘরের দরজার সামনে এসেই রুমালে চোখ দুটো মুছে নিয়ে দাদুর ছেলে বললেন, "এই ঘর···বাবা ভেতরে আছেন, যান আপনি।"

পালঙ্কের পাশে একটা সোফায় বসেছিলেন অবলাবাবু, সুব্রতকে দেখেই ব'লে উঠলেন, "এসো ভাই, তোমার কল্যাণে 'সোনা'-দিদিমণিকে চোখে দেখে আজ আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। কি ব'লে যে আশীর্ব্বাদ করবো তোমায়···"

বিশুষ্ক লতার মত শয্যার সঙ্গে প্রায় মিশিয়ে আছে স্বর্ণলতা···মলিন সোনার প্রতিমা···দাদুর আদরের 'সোনা'।

রুগ্না মেয়েটি কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সুব্রতর মুখের পানে, তারপর শীর্ণ হাত দুটি ধীরে-ধীরে তুলে নমস্কার জানিয়ে বলে, "ও—আপনি! আপনি এসেছেন আমায় দেখতে?" চক্‌চক্ করে স্বর্ণলতার শুক্‌নো চোখ দুটি।··· ঐ এতটুকু জলই কোথায় লুকিয়ে ছিল কে জানে!

অবাক হয়ে যান অবলাবাবু। স্বর্ণ আর সুব্রতর মুখের দিকে ঘন-ঘন চাইতে থাকেন—সোনা কেমন ক'রে চিনলে সুব্রতকে? কি যে সম্ভব নয় জগতে···

সুব্রতও আশ্চর্য্য হয়ে যায় স্বর্ণলতার কথা শুনে—কে এ মেয়ে?

মীমাংসা ক'রে দেয় মেয়েটি এঁদের তু'জনের সমস্যার। সেদিনের কথা ওর আর মনে থাকবে না কেন। বিয়ের ক'নে পরের দিন যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছিলো, গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা পড়তে ইনিই তো নৈহাটি-স্টেশনে গাড়ীর দরজা খুলে দিয়ে তুলে নিয়েছিলেন বর-ক'নে সমেত সঙ্গের সব লোককে কামরায়। তারপর মণিরামপুরের ওর শ্বশুরবাড়ীর স্টেশন 'কাশিমপুর'-এ গাড়ী থামতেই উনি নেমে গেলেন প্লাটফর্মের লোহার থামের আড়ালে যে সুন্দরী মেয়েটি ওর দিকে আর ওর বরের দিকে তাকিয়ে ফুলে-ফুলে কাঁদছিল তার কাছে···কি সব কথা কইলেন মেয়েটির পাশের সেই প্রবীণাটির সঙ্গে এ আর মনে থাকবে না? অতক্ষণ ট্রেনে ব'সে ওদের লোকের সঙ্গে কথা কওয়া—বিশেষ ক'রে স্বামীর সঙ্গে জীবনের যোগসূত্র ছিন্ন ক'রে দিয়েছে যে মেয়েটি, তার সঙ্গে যাঁর পরিচয় হয়েছিল সেদিন, তাঁর চেহারাটাই তো ওর ব্যথিত-জীবনের প্রথম সাক্ষী।

দাতু জিগেস করলেন, "তুই একে চিনিস্, সোনা?"

সংক্ষেপে সব বুঝিয়ে দিয়ে স্বর্ণলতা বললে, "হ্যাঁ। আপনিই তো একটু আগে চিনিয়ে দিয়েছেন। উনি আমার দাদাভাই।"

তিনজনেরই চোখের কোলে অশ্রু এসে পড়ে···সুব্রত এ-সুযোগের অপব্যবহার করে না, বলে, "আচ্ছা, আজকের মতন আমায় ছুটি দিন দাতু! জানেন তো, কি কষ্টে পেয়েছি আমি এই চাকরিটুকু···একটা ছুটির দিন দেখে আবার আসবো আমি। অনেক কথা বলবার আর শোনবার আছে আমার,

সেদিন এসে আলোচনা করবো এ-প্রসঙ্গ নিয়ে। এখনো যা সময় আছে, ট্রেন ধরতে পারলে ঠিক সময়েই হাজির হতে পারবো অফিসে।"

ব'লে পকেট থেকে স্বর্ণলতার নাম-লেখা সোনার সিঁদুর-কৌটোটি বের ক'রে দাদুর হাতে দিয়ে বললে, "এই সামান্য উপহারটি এনিছি আমি আমার এই বোন্‌টির জন্যে, আর এর মধ্যে আপনার—"

নাতনীর নাম-লেখা সোনার কৌটোটা দেখে দাদু খুব খুশী হলেন। তারপর ডালাটি খুলে তার মধ্যে আধুলিটি দেখেই ওঁর আর বুঝতে বাকি রইলো না কিছু। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "এটি হচ্ছে তোমার সেই ঋণ-পরিশোধের আধুলি—না? আর তুমি এসেছো। যাক্‌, তোমার ধর্ম্ম তোমার কাছে। কিন্তু না খাইয়ে তো তোমায় ছুটি দিতে পারবো না ভাই। অন্তত চা-টা খেয়ে আমার অতিথি-সৎকারের পুণ্য-সঞ্চয়ের হেতু হয়ে আনন্দ দিয়ে যাও আমায়।"

দাদুর এ-ইচ্ছা পূর্ণ সুব্রতকে করতেই হলো। তারপর ওঁর ছেলের সঙ্গে আরো-কিছু কথাবার্ত্তা কয়ে চা-টা খেয়ে সুব্রত তখনকার মত বিদায় নিলে দাদুর পায়ের ধূলো নিয়ে, বাড়ীর লোকেদের যথাযোগ্য অভিবাদন আর আপ্যায়িত ক'রে। কিন্তু 'চা'র সঙ্গে যা 'টা' খেয়ে ফিরলো সুব্রত, তা ওর সারাদিনের মত পেট-ভ'রে-যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

সুব্রতকে গাড়ীতে তুলে দেবার আগে কাঁদতে-কাঁদতে দাদু

বললেন, "আবার ঠিক আসিস্ ভাই সুব্বের্তো। এই চক্রব্যূহে বন্দী ক'রে রেখে গিয়ে আমায় ভুলে থাকিস্নি যেন।" তারপর সুব্রতর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি জিগেস করলেন, "আমার পা ছুঁয়ে একটা সত্যি কথা ব'লে যা, সোনা আমার বাঁচবে তো? কি রোগ হয়েছে বললে তোকে ওর বাবা?"

সুব্রত আশ্বাস দিলে, "না-বাঁচবার মত কোনো রোগ তো হয়নি দাদু স্বর্ণলতার। আপনাদের ডাক্তার হয়তো ঠিক 'ডাইয়্যাগনোসিস্' করতে পারেননি তাই কঠিন রোগের কথা জানিয়েছেন আপনাদের। তাছাড়া আজ যখন বিলাত-বিখ্যাত কলকাতার শ্রেষ্ঠ 'চেষ্ট-স্পেশালিষ্ট' বি. কে. পাল আসছেন দুপুরবেলা স্বর্ণলতাকে দেখতে কলকাতা থেকে···নিশ্চিন্ত থাকুন। এর চেয়ে কঠিন-কঠিন রোগের হাজার-হাজার রুগীকে তিনি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত করেছেন এ আমি জানি।"

তারপর দাদুর ঘরের 'ব্রুহেম'-ঘোড়ার গাড়ীতে ব'সে স্টেশনে যাবার পথে সুব্রত ভাবলে, কি আশ্চর্য্য! স্বর্ণলতা—কন্দর্প-কান্তির বউ?···

কন্দর্পর কথা ভাবতে গিয়ে সুব্রতর সুমিত্রার কথা মনে পড়লো। না, আজ আর অফিসে 'এ্যাটেণ্ড' করা ভাগ্যে নেই দেখছি।

নৈহাটি স্টেশনের কাছের পোস্টঅফিস থেকে সুব্রত একটা আর্জেন্ট-টেলিগ্রাম ক'রে দিলে ওর বর্ত্তমান অবস্থার কথা

জানিয়ে মিঃ গাঙ্গুলীকে, তারপর আপ্-ট্রেনে উঠে চললো কাশিমপুর স্টেশনের পাশে সুমিত্রাদের বাড়ীর উদ্দেশে।

সেখানে গিয়ে যা শুনলে সুমিত্রার ঠাকুরমার মুখে, সেটা শোনবার মত কথা নয়···কিছুদিন আগে এক তমিস্রা রাতে কাউকে কিছু না জানিয়ে চুপিচুপি সুমিত্রা পালিয়ে গেছে কন্দর্পর সঙ্গে।

সুব্রত অবাক হয়ে গেল বৃদ্ধার মুখে সুমিত্রার পালিয়ে যাওয়ার কথা শুনে।

অফিসের কাজ ফেলে দুপুরবেলা হঠাৎ বাড়ী ফিরে এসে মিঃ গাঙ্গুলী তাঁর কাজ করবার নিজস্ব-ঘরে ঢুকেই একসঙ্গে দু'খানা পাখা চালিয়ে দিয়ে বসলেন চেয়ারে।

এমন সময় ওঁকে অফিস ছেড়ে বাড়ীতে আসতে কেউ ভাখেনি কখনো।

বাড়ীর দরজায় পরিচিত 'হর্ণ' শুনে ওপরের জানলা দিয়ে স্বামীকে হঠাৎ এই দুপুরবেলায় চলে আসতে দেখে উমাদেবী তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসে কখন চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়েছেন জানেন না মিঃ গাঙ্গুলী। তিনি তখন অফিসের বাড়তি-কাজ যা অবরে-সবরে ছুটির দিন অবসর মত ক'রে থাকেন তারই

দু'খানা খাতা টেনে নিয়ে মিলিয়ে-মিলিয়ে টিপ মারছেন, দাগ টানছেন আর সই করছেন।...সময় কাটাতে হবে তো।

উদ্বিগ্ন মন নিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাজ ক'রে যাচ্ছেন গাঙ্গুলীসাহেব, এমন সময় গলার স্বর খাটো ক'রে উমাদেবী জিগেস করলেন পেছনে থেকে, "বেলা একটার সময় হঠাৎ অফিস থেকে চলে এলে যে! শরীর ভালো আছে তো?"

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মিঃ গাঙ্গুলী বললেন, "কেন, আমার কি কোনোদিন সকাল-সকাল বাড়ী ফিরতে নেই?"

উমাদেবী বললেন, "তা আবার থাকবে না কেন। তবে আমার বিয়ের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত দিনের আলোয় কখনো দেখিনি তোমায় বাড়ীতে, কাজেই ভয় হয়। ভেবে-ভেবে কি চেহারা হয়েছে তোমার বলো তো? কি এত ভাবো তুমি?"...

পেছন থেকে সামনে এসে দাঁড়ালেন উমাদেবী। স্বামীর হাতের নীচে থেকে একখানা খাতা টেনে নিয়ে অভিমানের সুরে বললেন, "শোনো, আজ তোমায় শুনতে হবে আমার কথা। কোনো দিনই তোমার সম্বন্ধে একটি কথা বলিনি, বলবার অধিকারও দাওনি আমায়, বরাবর দূরে-দূরে রেখেছো, আমিও স'রে-স'রে গেছি। সে নির্ব্বাসনের কারণও আমার অজানা নেই। আমার একমাত্র সন্তান পাছে আমার কাছে মানুষ হ'লে তোমার মনের মতো না হয় তাই তাকে এতটুকু বেলা হতে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে মেমসাহেবের কাছে রেখেছো, যাতে সে তোমার আদর্শে গ'ড়ে উঠে তাদের বিলাসের

আসরে তোমার মান রাখতে পারে। এমন কি, আমার-দেয়া 'যমুনা' নামটা পর্য্যন্ত বদ্‌লে, মেমেদের নকল ক'রে তার নাম রেখেছো—'প্যামেলা'। তুমি যা চেয়েছিলে তাই হয়েছে। এখন যদি নিজের ইচ্ছেয় সে যা খুশি করে তাতে একটি কথাও বলা চলবে না তোমার। আমি শুনেছি আমার যমুনা, মানে, তোমার প্যামেলা ভিন্নধর্ম্মে দীক্ষা নিচ্ছে, অথচ সেটাও সহ্য হচ্ছে না তোমার, তাই তুমি ভেবে-ভেবে ক্রমেই দুর্ব্বল হয়ে পড়ছো। আজকের এই অসময়ে অফিস থেকে চলে আসাটাও তার একটা কারণ। আগের মতো মাথা ঠিক রেখে কোনো কাজে আর মন দিতে পারছো না তুমি।"

ম্লান হেসে মিঃ গাঙ্গুলী বললেন, "না না, কারণ তা নয়। তুমি ভুল বুঝেছো।"

দৃঢ়স্বরে উমাদেবী বললেন, "না। ভুল বুঝিনি। দূরে স'রে থাক্‌লেও তোমার স্ত্রী তো আমি। হাজার ক্রোশ দূরে থেকেও বাঙালী-মেয়ে তার স্বামীর সুখ-দুঃখ সমান ভাবে অনুভব করতে পারে নিজের বুকে, সে-কথা আর সাহেবমানুষ তুমি কি বুঝবে। থাক্ সে কথা। আজ আমি বলতে চাই, যথেষ্ট বয়েস হয়েছে তোমার, ভাঙা-দেহ চায় তোমার এখন বিশ্রাম। অথচ এ দুর্দ্দিনে তোমায় দেখবার কেউ নেই, তাই আমি এসেছি এগিয়ে। আজ তুমি আমায় যতই অপমান করো আর যত আঘাতই হানো আমার মাথায় আমি সইবো।...এক বছর দু-বছর নয়, মনে করো, কত—কতদিন আগে থেকে আমি

দূরে স'রে আছি। তখন তোমার সুদিন ছিল, দেহে শক্তি-সামর্থ্য, মনে আশা-উৎসাহ ছিল···কোথায় কে অন্দরে একটা দাসী প'ড়ে আছে পূজো-আচ্ছা নিয়ে, তার কথা মনেও থাকতো না তোমার। কিন্তু আজ তোমার নিজের বলতে আর কেউ নেই, কিছু নেই···"

শুকনো নীরব-হাসি হাসবার চেষ্টা ক'রে মিঃ গাঙ্গুলী বললেন, "সব আছে উমা, সব আছে। কিছু হারাইনি আমি।"

উমাদেবী বললেন, "কে আর আছে? একটি মাত্র মেয়ে ছিল যাকে তোমার মনের মতো বিলিতী-ধাঁচে তৈরী করতে চেয়েছিলে, নিজের বুদ্ধির দোষে তাকেও হারিয়েছো। মুখে স্বীকার না করলেও, নিজের মনে জানো কি অন্যায় কাজ করেছো তুমি, যার জন্যে তোমার সুখ শান্তি স্বাস্থ্য সব গেল। আজ নিশ্চয় ভাবছো, যে, ভুল-পথে চলে কেন এ-কাজ করলে। কিন্তু এ 'কেন'র কৈফিয়ৎ দেবে তুমি কার কাছে?"

"উমা? উমা?"···আত্মসম্বরণে অসমর্থ মিঃ গাঙ্গুলী-বনাম বিমলেন্দু এতক্ষণ পরে টেবলের ওপর ঝুঁকে পড়ে মুখ লুকোতে চেষ্টা করেন।

স্বামীর অবিন্যস্ত চুলের ওপর সস্নেহে হাত বুলোতে-বুলোতে উমাদেবী ঠিক দেবীর মতই অভয় দিয়ে বলেন, "দুঃখ কিসের? কেন ভেঙে পড়ছো তুমি? সে কি শুধু তোমারই সন্তান—আমার নয়? তুমি তার বাপ, কিন্তু আমি যে তার মা।

আমার বুকের রক্ত দুধের আকারে তার মুখে দিয়েছি, আমার সব আশা, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ…”

আর বলতে পারেন না উমাদেবী। এমন করেও কেউ বঞ্চিত করে নিজের গর্ভধারিণী মাকে ?…

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেন উনি।

ধরা-গলায় বিমলেন্দু বললেন, “ভুলই করেছি উমা, খুব ভুল করেছি তাই আমার ঘরের মেয়ে হয়েছে খাঁটি মেম-সাহেব, আজ সে আমাকেই মানতে চায় না। বিলিতী-মোহে প'ড়ে আগে বুঝতে পারিনি যে, মিথ্যে বিলাস-সমারোহের ভিড়ে এমন ক'রে হারিয়ে যাবে আমার মেয়ে—”

বাধা দেন উমাদেবী—“কি হয়েছে তাতে ? হারিয়ে গেছে সে বহুকাল আগেই। আজ তার মৃত্যু-খবর পেলেম, নিশ্চিন্ত হলেম। আর তার জন্যে ভাবতে হবে না—সঞ্চয় করতে হবে না—তার বিসর্জ্জন হয়ে গেল। স্বধর্ম্ম ছেড়ে যে অন্য ধর্ম্মে দীক্ষা নিতে চলেছে, বিসর্জ্জন ছাড়া আর কি বলবো তাকে ? যাক্ সে। তুমি ফিরে এসো। চিরকাল পরিশ্রম করেছো, মনের দিক দিয়েও ক্ষত-বিক্ষত হয়েছো জীবন-যুদ্ধে…এবার বিশ্রাম নেবে এসো।”

আস্তে-আস্তে স্বামীর মাথায় তখন থেকে হাত বুলোচ্ছেন উমাদেবী। টেবলে মাথা রেখে চুপ ক'রে তাঁর সেবা নিচ্ছেন মিঃ গাঙ্গুলী—বিমলেন্দু। বহুকাল পরে আজ নতুন ক'রে পেলেন তিনি স্ত্রীর হাতের মমতা-ভরা স্নেহকোমল স্পর্শ…স্মরণে

এলো হারানো-অতীতের কত পুরনো কথা···সতেরো বছরের ছেলে, ন-বছরের মেয়ে তার স্ত্রী···তখন না ছিল কোনো আশা, না ছিল বড় হওয়ার উগ্র-উৎকট বাসনা···স্বামী-স্ত্রীতে চলতো নিত্য ঝগড়া-বিবাদ-মারামারি-কান্নাকাটি···

সেদিন কেন রইলো না ?

সেদিন ছিল না সাগরপারের পাতাবাহার মরসুমী-ফুলের কোনো মোহ, যা শহরে এসে তাকে বিভ্রান্ত করলে।···হারিয়ে ফেললেন সরলা বালিকা স্ত্রীকে, নকল-সাহেবীয়ানার নেশার ঘোরে সোজা পথ ছেড়ে ধরলেন বাঁকা পথ। কিন্তু টলাতে পারলেন না তাঁর স্ত্রীকে। স্বামীর আদেশ পালন করতে দু-তিন দিন ক্লাব-পার্টি-লজ ইত্যাদিতে ঘুরে এসে উমাদেবী অন্তঃপুরে ঢুকে সেই যে তাঁর পূজা-পার্ব্বণ-গীতা-উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারত নিয়ে মেতে রইলেন, তারপর থেকে তাঁকে সহচারিণী রূপে কোনোদিন পেলেন না বিমলেন্দু।···ভাবলেন, মার কথা শুনে যেমন অজ-পাড়াগাঁর মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন···পুতুল-পূজো ছাড়া শিক্ষিত-সমাজে মেশার মর্ম্ম সে কি বুঝবে ? তা না বুঝুক, তাই ব'লে তো তাঁর মেয়েকে ঐ মায়ের আদর্শে গড়তে পারেন না তিনি। কেড়ে নিলেন উমাদেবীর কাছ থেকে তাঁর আদরের মেয়ে যমুনাকে···নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে দিয়ে এলেন 'কনভেন্ট'-এ তাঁর ইওরোপীয়ান-বান্ধবী মিস্ সিমসনের কাছে ইংরেজী-শিক্ষায় শিক্ষিতা অতি আধুনিকা ক'রে গ'ড়ে তোলবার জন্যে।

মিস্ সিমসন তো এই চান। খুশী হয়ে মেয়েটির চিবুক ধ'রে জিগেস করলেন, "তোমার নাম কি আছে, চাইল্ড্?"

যমুনা বললে, "আমার নাম যমুনা।"

মিস্ সিমসন বললেন, "বেশ নাম, খাসা নাম—য-মু-না। কিন্তু ও-নামটা তোমার হিন্দু-নামের নমুনা। আজ থেকে তোমার নূতন নাম হলো—'প্যামেলা'।"...

খুশী হয়েছিলেন সেদিন বিমলেন্দু। কিন্তু আজ? আজ তাঁর সেই প্যামেলা এমন শিক্ষায় শিক্ষিতা হয়েছে যে, স্বজাতির মজ্জাগত সংস্কার বিস্মৃত হয়ে, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে, পরকীয় খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করতে চলেছে...তার ধর্ম্ম-পিতা নামে পরিচিত হবেন আর-একজন। ছি ছি, আগুন নিয়ে কেন তিনি খেলা করতে গেলেন?...

সহসা চিন্তাস্রোতে বাধা পড়লো। দরজার বাইরে থেকে চাপরাসী জানালে, "সাব্, মিত্তির-সাব্ আয়া।"...

সোজা হয়ে বসলেন মিঃ গাঙ্গুলী। পরদা সরিয়ে উমাদেবী ভেতরদিকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

'কলিংবেল' টিপে চাপরাসীকে ডেকে গাঙ্গুলীসাহেব বললেন, "ভিতরমে লে-আও, সাব্‌কো।"

অ্যাসিষ্টান্ট-ক্লার্ক সুব্রত মিত্র এসে অভিবাদন জানিয়ে বললে, "তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন সার্, সাপ্লাই-ফর্মগুলো 'সাইন্' করা হয়নি। আজই 'ডেস্‌প্যাচ' করতে হবে তাই সেগুলো সঙ্গে ক'রে এনেছি।"

"তাই নাকি? কৈ দেখি", ব'লে কাগজগুলো নিয়ে সই করতে-করতে বললেন, "কাল পাঠালেও চলবে এগুলো। এখন আমায় একবার আমাদের 'ওল্ড কাস্টমার' আর প্রিয় বন্ধু মিঃ বাসুর বাড়ীতে যেতে হবে। তাঁর বাড়ীতে খুব বিপদ। তুমি এসেছো, ভালোই হয়েছে—তুমিও চলো আমার সঙ্গে। অফিসের বাকি কাজগুলো সব মিটিয়ে এসেছো তো?"

সুব্রত বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ সার্।"

যতীন্দ্রনাথ বসুই যে 'মিঃ বাসু' এটা আগে জানলে আসতে রাজী হতো না সুব্রত।

দেশের সেই তালপুকুরের বাঁকে সপার্ষদ জমিদার যতীন্দ্র-নাথের সঙ্গে দেখা···সেদিন কিংবা তার পরদিন শ্যামবাজারের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার প্রতিশ্রুতি দেয়া···তারপর আজ। এতদিন পরে কাকাবাবুর সামনে দাঁড়াবে কেমন ক'রে ভাবছে সুব্রত, কিন্তু এ তো আর গরুর গাড়ী নয়—মোটরকার। গাঙ্গুলীসাহেবকে যাহয় একটা কিছু ব'লে ঐ রাস্তাটার মোড়ে নেমে যাবে কি না ভাবতে-ভাবতেই হাওয়ার বেগে এসে গাড়ীখানা একেবারে বাড়ীর গেটের···

যতীন্দ্রনাথ তখন খোলা-গাড়ীবারান্দার মাথায় ভারাক্রান্ত মনে পায়চারি করছিলেন, সেখান থেকে মিঃ গাঙ্গুলীকে দেখে আস্তে-আস্তে নেমে এসে তাঁর সঙ্গে করমর্দ্দন করলেন···

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে সুব্রত উঠে দাঁড়াতেই ওর মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ জানালেন। সেদিন কথা দিয়েও দেখা না ক'রে সুব্রত এতকাল আত্মগোপন ক'রে ছিল কেন সে-সম্বন্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না।

মিঃ গাঙ্গুলীই প্রথমে কথা কইলেন, বললেন, "মিঃ বাসু, এবার আপনার মেয়ের খবর বলুন। তার সাংঘাতিক অসুখের খবর পেয়েও এ ক'দিন আমার মেয়েকে নিয়ে এমন বিব্রত হয়ে ছিলেম যে, আসবার দারুণ ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আসা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সে-কথা পরে জানাচ্ছি।"

যতীন্দ্রনাথ বললেন "আপনাদের শুভেচ্ছায় একটু ভালোর দিকে এসেছে বটে, কিন্তু এখনো দিন-রাতের মধ্যে অন্তত দু-তিনবার চলেছে সেই অলৌকিক প্রলাপ। আজ প্রায় দু-হপ্তা হলো বাড়ীসুদ্ধ লোক ওকে নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। কি আর বলবো, সবই আমার ভাগ্য। এবার আবার এমন একটা নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে যে, সেটা সুরু করলেই, শুনে ওর মার 'ফিট্' হতে থাকে।...সে-সব কথা এ-জগতের নয়। জাতিস্মর ভিন্ন কেউ বলতে পারে না তেমন কথা। মনে হয় ও যেন সব দেখতে পাচ্ছে।"

মিঃ গাঙ্গুলী বললেন, "না না, পরলোক বা পূর্ব্বজন্মের কিছু দেখতে পাওয়া—ওসব একেবারেই আজগুবী কথা। ও একরকম রোগ। মাথার রোগ যে মানুষের কত রকমই হয়। এই দেখুন না, আপনার মেয়ের মস্তিষ্কবিকৃতি, আমার

মেয়েটি সুস্থ থাকলে কি হবে—'ডিফেক্‌টিভ ব্রেন্‌'। ওতে হতাশ হবার এমন কিছু নেই।"

আর, কাকাবাবুর কথা শুনে সুব্রত মনে-মনে ভাবছিল, তবেই ভালো হয়েছে গঙ্গোত্রী! কিন্তু মুখে সাহস দেখিয়ে বললে, "সার্‌ যা বলেছেন, ঐ কথাই ঠিক। ও একটা রোগ। তবে এ-রোগ সারাবার একটা সহজ উপায় আছে। সেটা শুনেছিলুম আমি আমাদের সায়েন্সের প্রফেসরের মুখে। তিনি নাকি তুটি উন্মাদ রোগীকে সেই সহজ উপায়ে আরাম করতে পেরেছিলেন, তবে তার জন্যে সময় লেগেছিল অনেক। সে উপায়টা হচ্ছে এই যে, কোনো প্রতিবাদ না ক'রে বা বাধা না দিয়ে উন্মাদ-রোগীর প্রত্যেক কথায় সায় দিয়ে যেতে হবে। আমার মনে হয় কাকাবাবু, এ যুক্তি একেবারে অমূলক নয়। বিকৃতমস্তিষ্ক রোগীর উত্তেজনা প্রশমন করতে হ'লে কোনো রকম বাধা দিতে বা তর্ক করতে নেই, তার গোড়ে গোড় দিতে হয়, তাহলেই রোগীর মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম 'ভেন্‌'গুলোর 'ফোর্স' কমে গিয়ে সে নিস্তেজ হয়ে পড়বে, তখন চেষ্টা ক'রে তাকে ঘুম পাড়াতে পারলেই, জেগে উঠে সে তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাবে।"

যতীন্দ্রনাথের খুব ভালো লাগলো সুব্রতর এই কথাগুলো। বললেন, "তুমি একটু চেষ্টা ক'রে ত্থাখো না বাবা সুব্রত। তোমার কল্যাণে যাতে গঙ্গা আমার আবার তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে।"

শুনে সুব্রত মাথা হেঁট ক'রে রইলো, কোনো জবাব দিতে পারলে না।

আরো কিছুক্ষণ এ-সম্বন্ধে আলোচনা চালাতে-চালাতে গাঙ্গুলীসাহেব ভুলে গেলেন যে, মিঃ বাসুকে তিনি তাঁর নিজের মেয়ের কথা জানাবেন বলেছিলেন।...টেবল থেকে হ্যাটটা তুলে নিয়ে তিনি শুধু বললেন, "আচ্ছা, আজকের মতো আসি মিঃ বাসু। কল্যাণময় ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন আপনার মেয়েকে শীগগির নিরাময় ক'রে তোলেন।" ব'লে সুব্রতর দিকে ফিরে বললেন, "তাহলে তো তোমায় এবার উঠতে হয়।"

বন্ধু যতীন্দ্রনাথ বললেন, "মিঃ গাঙ্গুলী, আমি জানি, সুব্রত আপনার অনুগ্রহে চাকরি পেয়ে আপনার তাঁবেই কাজ করছে। আমার অনুরোধ, অন্ততঃ দু'চার দিনের জন্যে ওর ছুটি মঞ্জুর ক'রে আপনি আমার উপকার করেন।"

"আনন্দের সঙ্গে।" ব'লে অনুমতি দিয়ে, অভিবাদন জানিয়ে মিঃ গাঙ্গুলী গিয়ে তাঁর মোটরে উঠলেন। কাকাবাবুর পেছনে-পেছনে সুব্রত চললো তাঁর অন্তঃপুরের দিকে।

ডাক্তার রুদ্র তখন রোগী দেখে ফিরছেন, যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতেই বললেন, "মনে হয় সার্, এ-যাত্রায়ও রক্ষা পেয়ে গেল গঙ্গোত্রী।"

যতীন্দ্রনাথ বললেন, "সেটা আমাদের বরাত আর আপনার হাতযশ।"

দোতলার বারান্দায় উঠেই সামনে যাকে দেখলে, তাকে এখানে দেখবার কল্পনাও করেনি সুব্রত। আশ্চর্য্য হয়ে ব'লে উঠলো, "কল্যাণী! তুই এখানে—"

রোগীনীর জন্যে পথ্য নিয়ে যাচ্ছিলো কল্যাণী, সুব্রতর আহ্বানে ফিরে দাঁড়াতেই, যতীন্দ্রনাথ বললেন, "সুব্রতকে নিয়ে এসেছি কল্যাণী। বিন্দুর হাতে গঙ্গার পথ্য দিয়ে তুমি গিয়ে তোমার বাবাকে জানিয়ে এসো।"

"আমার বাবা!" সুব্রত অবাক হয়ে যায় কাকাবাবুর কথা শুনে। কল্যাণী ততক্ষণে দাদাকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়িয়েছে।

যতীন্দ্রনাথ বললেন, "দিন-আষ্টেক আগে যেদিন তোমার বাবা আমাদের কুশল জানতে চেয়ে পত্র পাঠিয়েছিলেন, সেদিন ডাক্তাররা প্রায় একরকম জবাবই দিয়ে গেলেন, ব'লে গেলেন, 'চেষ্টা তো করলুম আমরা, এখন ভগবানের হাত।' শুনে মনের যা অবস্থা হলো বুঝতেই পারছো। সত্য কথা জানিয়ে সেই সংবাদ দেবার পর তোমার বাবা কল্যাণীকে আর তোমার পিসীমাকে নিয়ে চলে এসেছেন এখানে। কল্যাণী আসায় যে কি উপকার হয়েছে আমার! এমন দরদ দিয়ে গঙ্গার সেবা না করলে আমরা কি আর ফিরে পেতুম মেয়েকে..."

এদের ভাই-বোনকে কথা বলবার অবকাশ দিয়ে যতীন্দ্র-নাথ চলে গেলেন গঙ্গোত্রীর ঘরের দিকে।

সুব্রতকে পাশের ঘরে নিয়ে যায় কল্যাণী, বলে, "কি লোক তুমি, দাদা ? দু-বছরের ওপর বাড়ী-ছাড়া···কি হলো না হলো, কে বাঁচলো-ম'লো একটা খবর পর্য্যন্ত নিলে না কারুর ?"

সুব্রত হাসবার চেষ্টা করে, বলে, "চাকরি করছি যে রে—টাকা জমাচ্ছি। বাড়ীটা তো ছাড়াতে হবে। আমি যে প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছি কল্যাণী, বাড়ী খালাস না হওয়া পর্য্যন্ত কারুর খবর নেবোও না, দেবোও না কাউকে আমার খবর।"

কল্যাণী বললে, "কিন্তু কবে ? কত যুগ তার জন্যে অপেক্ষা করবেন বাবা আর পিসীমা ? অফিসে কত হাজার টাকা মাইনে হয়েছে মাসে তোমার, শুনি ?"

সুব্রত বললে, "এ-কথাটা তুই ঠিকই বলিছিস্ ভাই। আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবি সময়ে-সময়ে। কিন্তু সৎ-ভাবে রোজগার ক'রে সময়ের অপেক্ষা করা ছাড়া আমার পক্ষে এখন আর অন্য কি উপায় আছে বল্ ।"

কল্যাণী বললে, "সে উপায় আবিষ্কার করবার জন্যে তোমায় আর লুকিয়ে ব'সে থাকতে হবে না দাদা, নিরুপায়ের উপায় যিনি চিরদিন ক'রে থাকেন, সেই দেবতাই সে-উপায় ক'রে দিয়েছেন। বাড়ী কাকাবাবু ফিরিয়ে দিয়েছেন, তার সঙ্গে দেনার যা-কিছু দলিলপত্র ছিল বাবার সই-করা, সব—সব তিনি ফেরত দিয়ে গেছেন বাবাকে। এবার তার বিনিময়ে

তুমি কি করতে পারো কাকাবাবুর জন্যে এখন তার উপায় ভাবো।”

কল্যাণীর মুখে এ-কথা শুনে আনন্দে মনের বল অসম্ভব বেড়ে ওঠবার কথা, কিন্তু বহুদিনের সঞ্চিত পুঞ্জীভূত ব্যথার নিশ্বাসটা স্বস্তির তৃপ্তি দিতে-দিতে এমনভাবে বেরিয়ে গিয়ে সুব্রতর বুকটা খালি ক'রে দিলে, যার ফলে ও খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়লো। এবার? এবার কাকাবাবুর জন্যে কি করবে সে?…

সে-কথা এরপর ভাবতে হবে বৈকি অকৃতজ্ঞ সুব্রতকে।

কোঁচার খুঁটে চোখের জল মুছে সুব্রত বললে, “এরপর তোকে জানাবো কি করবো আমি। হ্যাঁ, একটা খুব সুখবর আছে কল্যাণী, যা শুনলে তুই খুব খুশী হবি। তোর অভিশাপটা হাড়ে-হাড়ে ফলে গেছে সেই লোকটার ওপর।”

দারুণ আগ্রহে কল্যাণী ব'লে উঠলো, “অভিশাপ? শাপমন্যি আবার কবে দিয়েছি আমি কাকে?”

সুব্রত বললে, “সেই যে রে, সেই লোকনাথ ভট্‌চায্যি ব'লে লোকটা, যে জোর ক'রে তার ছেলে কন্দর্পকান্তির ভাবি-বউ সুমিত্রাকে শুধু গরীব ব'লে বিয়ে ভেঙে দিয়ে নৈহাটির এক বড়লোকের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিল। মনে পড়ছে না তোর? সেই বাবার অসুখের চিঠি পেয়ে হাজারীবাগের চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমি ট্রেন থেকে নেমেই যে-মেয়েটিকে থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখিছিলুম?”

কল্যাণী বললে, “কি হয়েছে তার?”

সুব্রত বললে, "বিয়ের বছরখানেক পরে, তার বাপ লোকনাথ ভট্‌চায্যির মুখে চুন-কালি মাখিয়ে সুমিত্রার বাল্য-সঙ্গী সেই কন্দর্পকান্তি তার বিয়ে-করা বউকে ফেলে, সুমিত্রাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে কোথায় তার পাত্তাই নেই। তুই বলিছিলি, সেই লোকনাথ ভট্‌চায্যি লোকটা এর শাস্তি পাবেই।···ছাখ., তোর সেই শাপটা হাড়ে-হাড়ে ফলে গেছে কি না লোকনাথের।"

এ-কথা শুনে কল্যাণীর খুশী হবারই কথা, কিন্তু আবার ওকে আঁচলের খুঁটে চোখ মুছতে দেখে সুব্রত বললে, "আবার কি হলো?"

কল্যাণী বললে, "কিন্তু কন্দর্পর বিয়ে-করা বউটা—তার কি হবে?"

সুব্রত বললে, "সে অনেক কথা। তার সেই বিয়ে-করা বউটির নাম স্বর্ণলতা। নতুন এক সম্পর্কে সেই মেয়েটি আবার আমার বোন্ হয়েছে। আর-এক সময় বলবো তোকে তাদের ইতিহাস। এখন বাবার আর পিসীমার সঙ্গে আমার দেখা হবার বন্দোবস্ত ক'রে দে।"

কল্যাণী উঠে চলে গেল ঘর থেকে।

সন্ধ্যের পর কল্যাণীকে বললেন চন্দ্রিমাদেবী, সুব্রতকে তাঁর ঘরে ডেকে আনতে।

সুব্রত এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতেই তিনি বললেন,

"এমনি করেই কি লুকিয়ে ব'সে থাকতে হয় বাবা? নাই-বা গ্রহণ করলে তুমি আমার গঙ্গাকে, একবার খবরটাও তো নেবে আমাদের এই বিপদের দিনে? যাক্, সে-কথা তুলে তোমায় আর লজ্জা দেবো না, কল্যাণীর সঙ্গে গিয়ে গঙ্গাকে একবার দেখে এসো এখন। তোমার কাকাবাবু বলছিলেন, তুমি নাকি উন্মাদ রুগী সারাবার কি একটা সহজ উপায় জানো···যাও, দেখে এসো, তারপর তোমার সঙ্গে আমার যা দরকারী কথা আছে সে-সব আলোচনা করবো। ···নিয়ে যাও কল্যাণী তোমার দাদাকে গঙ্গার ঘরে।"

অপরাধের লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে সুব্রত উঠে গেল কল্যাণীর সঙ্গে কাকীমার আদেশ পালন করতে।

বেশ শান্ত মেয়েটির মত শুয়ে আছে তরুণী গঙ্গোত্রী। রূপের প্রভা নষ্ট হয়নি এতটুকু, বরং মনে হয় ওর জ্যোতি যেন ঠিক্‌রে পড়তে চাচ্ছে। বড়লোকের মেয়ে তো। যেরকম ভোগবিলাসের মধ্যে আছে ও, তাছাড়া এ-রোগের দস্তুর, তোয়াজে থাকতে পারলে আর সেবা-শুশ্রূষা নার্সিং-এর অভাব না হ'লে সৌন্দর্য্য বাড়ে বই কমে না।

সুব্রতকে ঘরে ঢুকতে দেখেই হাসতে-হাসতে বিছানার ওপর উঠে ব'সে গঙ্গোত্রী বললে, "এই যে, এসে গেছ দেখছি। আচ্ছা ছেলে যাহোক্। আমি জন্মাবার আগে আমায় কথা দিয়ে রেখেছো আমায় ভুলবে না কোনোদিন, তারপর এই এতকাল পরে—ওঃ, কত কাল! চারিদিকে থৈ-থৈ করছে অথৈ জল···

ওপারে দাঁড়িয়ে তুমি আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকলে···আমি ভাসতে—ভাসতে—ভাসতে—ভাসতে—"

একটানা এইরকম আবোল-তাবোল ব'কে যাওয়ার পর ফুলে-ফুলে কাঁদতে-কাঁদতে শুয়ে পড়লো আবার আগের মত।

গঙ্গোত্রীর অবস্থা দেখে সুব্রতর মনে হলো, এ ধাক্কাটা হয়তো সাম্‌লে যাবে, কিন্তু সুস্থ হয়ে উঠতে ওর দেরী হবে। তবে ও সারবে। কারণ ও তো আর উন্মাদও নয়, অর্দ্ধোন্মাদও নয়। 'টাইফয়েড'-এর পর মাথার 'ভেন্‌-আর্টারী'গুলো 'ড্যামেজ' হয়ে যাওয়ার ফলেই এইরকম হয়েছে। বিকারগ্রস্ত রোগীর মত অসংলগ্ন কথা কইছে বটে, কিন্তু যে যা বলছে ওকে, সুস্থ মানুষের মত তার জবাব গোড়ার দিকে ঠিক-ঠিক দিতে-দিতে গুলিয়ে যাচ্ছে মাথাটা, তাই প্রলাপ বকতে সুরু করছে। ওই তো আবার—

সুব্রতর দিকে আঙুল দেখিয়ে গঙ্গোত্রী ব'লে উঠলো, "তুমি কি কম ছেলে? আমি যখন জন্মাইনি, তখন থেকে তুমি···হ্যাঁগা, ছ্যাখো, আমি তো চাঁদের আলোয় সেই ফুলবাগানে বসেছিলুম তুমি আসবে ব'লে, আর তুমি মেঘের ভেতর দিয়ে—মেঘের ভিতর দিয়ে ওপরে উঠে এসে আদর ক'রে আমার মাথায় ফুল গুঁজে দিলে···কি বড়ো ফুল আর কি সুন্দর গন্ধ—আ-আ-আ!"

যেন সেই কল্পিত-ফুলের আঘ্রাণ নিলে গঙ্গোত্রী চোখ বুঁজে, তারপর চোখ খুলে বললে, "আচ্ছা, সে ফুলটার নাম কি?"

সুব্রত বললে, "পারিজাত।"

শুনে গঙ্গোত্রী কি যেন ভাবলে, তারপর বললে, "তাই হবে। আর সেই বাগানটার নাম?"

সুব্রত বললে, "নন্দনকানন।"

খিল্‌খিল্‌ ক'রে হাসতে-হাসতে গঙ্গোত্রী ব'লে উঠলো, "কি সুন্দর!...উঃ, উঃ, এই দ্যাখো আমার পায়ের শিরটা টেনে ধরলো... চুঁচে দাও—মালিশ করো—নার্শ?"...

কল্যাণী তাড়াতাড়ি খাটের ওপর উঠে 'আয়োডিন্' মালিশ করতে বসলো যেখানটা দেখিয়ে দিলে গঙ্গোত্রী।

কিন্তু কতক্ষণ? সত্যি শির টেনে ধরেছে কি না তাই-বা কে বলবে। তখুনি বললে, "শীগগির আমায় একটু জল দাও কল্যাণীদি, খাবো।"

এ কি—উন্মাদের কথা?

অনেকক্ষণ গঙ্গোত্রী খায়নি কিছু। কল্যাণী ভাবলে, পাতলা ক'রে একটু বার্লি খাওয়াই এই সময়। 'রেফরিজেরেটার' থেকে বার্লির গেলাস আর জলের গেলাস বের ক'রে মিশিয়ে ফিডিংকাপে ঢেলে যেই মুখে দিয়েছে, 'থু-থু' ক'রে মুখ থেকে ফেলে দিয়ে, হাত দিয়ে কল্যাণীর হাতে এমন জোরে একটা ধাক্কা দিলে যে, ছিট্‌কে গিয়ে মার্ব্বেল পাথরের মেঝের ওপর প'ড়ে ফিডিংকাপটা চার-পাঁচ খণ্ডে টুক্‌রো হয়ে গেল।

বোধকরি নিজের দোষটা বুঝে সঙ্কুচিত হয়ে গঙ্গোত্রী

বললে, "আমি কি করবো?" বলেই সুব্রতর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, "ঐ ছ্যাখো না, ঐ ছেলেটা···"

বলতে-বলতে হঠাৎ পাশ থেকে তোয়ালেখানা তুলে নিয়ে মুখে যে গাল-বেয়ে বার্লি গড়িয়ে পড়েছিল, সেখানটা খুব জোরে-জোরে ঘষে হাত দিয়ে পরখ ক'রে নিয়ে বললে, "এঃ, চট্‌চট্‌ করছে! আমি যখন জন্মাইনি সেইসময় ঐ ছেলেটা এমনি ক'রে একদিন আমার মুখে···দুষ্টু! অসভ্য! দাঁড়াও আমি ব'লে দিচ্ছি মাকে—ও মা? মা?···"

সুব্রতর মুখ তখন লাল হয়ে উঠেছে—পাগলী-মেয়েটা বলে কি? হোক্‌ মিথ্যে কথা···কাকীমা এসে শুনলে তাঁর সামনে ও মুখ দেখাবে কেমন ক'রে!

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো কল্যাণীর মুখ—মুখ মোছানো বন্ধ রেখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে—কাকীমাকে এ-ঘরে আসতে নিষেধ করবার জন্যে। কিন্তু···

উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করেন পাশের ঘরে সর্ব্বক্ষণ চন্দ্রিমা-দেবী।···মেয়ের আহ্বানে প্রায় ছুটতে-ছুটতে এসেই গঙ্গোত্রীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন, "কি হয়েছে মা-মণি? কি কষ্ট হচ্ছে তোমার—বলো?"

গঙ্গোত্রী বললে, "ও, কষ্ট হচ্ছে—না? তা, কষ্ট হবে না মা? ছ্যাখো না, আমার 'ক্যারম্‌-বোর্ড'টা লুকিয়ে রেখেছে ওই ছেলেটা। ওকে দিতে বলো মা!"

সর্ব্বরক্ষে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো সুব্রত, বললে,

"লুকিয়ে রাখিনি তো। তুমি খেলবে ব'লে খেলার ঘরের টেবলের ওপর রেখে এলুম যে।"

"ও-ও-ও। তাই ব-লো। সেই বেশ হবে। তুমিও খেলবে আমার সঙ্গে? কি ভালো যে লাগে তোমার সঙ্গে খেলতে।"

সুব্রত বললে, "খেলবো বৈকি। তোমার সঙ্গে খেলবো বলেই তো এসিছি। এখন একটু ঘুমুবো আমি। তুমিও ঘুমোও। ঘুম থেকে উঠে দু'জনে খেলবো আমরা—কেমন?"

গঙ্গোত্রী বললে, "আচ্ছা। তোমরা সব চলে যাও ঘর থেকে। শুধু কল্যাণীদি থাকবে আমার কাছে, যতক্ষণ না আমি ঘুমিয়ে পড়ি।"

শান্ত মেয়েটির মত চোখ বুঁজে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলো গঙ্গোত্রী।

ঘর থেকে চলে যাবার সময় আঁচলে চোখ মুছতে-মুছতে চন্দ্রিমাদেবী মনে-মনে বললেন—ভগবান্! তাই কোরো ঠাকুর! গঙ্গা আর সুব্রতর আজকের এই ছেলেখেলা যেন···

সুব্রত ভাবলে, আজই পালাতে হবে এখন থেকে, আর নয়।

বিপদের সময় সেইরকম সমান বিপদে আর-কাউকে পড়তে দেখলে—হিংসায় নয়, প্রকৃতির নিয়মানুষায়ী মানুষের দুঃখের

ভারটা একটু হাল্‌কা হয়।···যাক্‌, তাহলে ভাগীদার পাওয়া গেল একজন।

মিঃ গাঙ্গুলী ভাবছিলেন বন্ধু মিঃ বাসুর কথা—আহা, সমান দুঃখী তাঁরা দু'জনে। ···"কে ?"

দরজায় কার একটা ছায়া পড়্‌লো, "কে—কে তুমি ?"

সজ্ঞানে সুস্থ-অবস্থায় পরিষ্কার স্পষ্ট শুনলেন গাঙ্গুলী-সাহেব—

"আমি প্যামেলা।"

শুনে যা ভাবলেন, সেই কথাটাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল গাঙ্গুলীসাহেবের—"কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার আর কি দরকার।"

"দরকার আছে বাবা—খুব দরকার আছে আপনার সঙ্গে আমার।"

"হয়তো আছে, কিন্তু আমার আর প্রয়োজন নেই তোমাকে।" ব'লে মিঃ গাঙ্গুলী উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন অন্যদিকে।···

কতক্ষণই-বা। সেই মুহূর্ত্তে চম্‌কে উঠলেন, একরাশ রুক্ষ এলোমেলো চুল ওঁর কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ঝিরঝিরে বাতাসে দোল খেতে-খেতে তরঙ্গের তুফান তুলেছে অনুভব ক'রে। ধীরে-ধীরে সেই চুলের ওপর স্নেহের স্পর্শ দিতে-দিতে বিমলেন্দু ফিরে গেলেন পেছনে-ফেলে-আসা পনেরো বছর আগের অতীতে···খেলা ফেলে ওঁর 'প্যাম্‌' ছুটে এসে

কাঁদছে কোলের ওপর মাথা রেখে। আর কি গাম্ভীর্য্য বজায় রাখা চলে ?…"কি হলো তোর, প্যাম্ ? কেউ বকেছে ? আঘাত করেছে কেউ তোকে ? কাঁদিস্‌নি মা, চুপ কর্, চুপ কর্। খুলে বল্ সব আমায়—"

বাবাও কাঁদেন, মেয়েও কাঁদে।

কাঁদতে-কাঁদতেই প্যামেলা বললে, "হ্যাঁ। আঘাত করেছে আমার বিবেক! আমি 'ব্যাপটিষ্ট' হইনি বাবা! হাজার ধিক্কার দিয়ে শুভ্রা আমার বিপথে-চলার গতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে…সিস্‌টারের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে আমি পালিয়ে এসেছি আপনার কাছে।"

"সত্যি ? ওরে, সত্যি বলছিস্ তুই ? দাঁড়া, দাঁড়া। এই সুখবরটা দিই আগে তোর মাকে—এই, কে আছিস্ ? ভেতর-বাড়ীতে শীগগির খবর দে মাঈজীকে, আমি দেখা করতে চাইছি… আঃ, যোগ বুঝে ঠিক এই সময় আমার বাড়ীতে কে আবার 'ব্যাণ্ড' পাঠিয়ে দিলে ? থামিয়ে দে, থামিয়ে দে…চলে যেতে বল্ ব্যাণ্ডওলাদের। কি ভীষণ শব্দ ওদের বাজনার! ওদের কি আক্কেল নেই একটু ?"

ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন বিমলেন্দু।

খবর পেয়ে প্রায় ছুটতে-ছুটতে নেমে আসেন উমাদেবী—"কি হলো গা ? শরীরটা কি খুব বেশী খারাপ করছে ? ফোন্ করবো ডাক্তারকে ?…আঃ, কী জোর বাজনার শব্দ! নিশ্চিন্ত হয়ে দুটো কথা কইবার জো নেই।"

তখুনি দরোয়ানকে আদেশ করলেন উমাদেবী, "পাশের বিয়েবাড়ীতে গিয়ে সাহেবের নাম ক'রে ব'লে এসো, কিছুক্ষণের জন্যে ওঁরা যেন ওঁদের 'এ্যাম্প্লিফায়ার'টা বন্ধ রাখেন, সাহেব হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।"

বিমলেন্দু বললেন, "অসুস্থ আবার কখন হলেম? এত সুস্থ বোধকরি আমি জীবনে কখনো ছিলেম না। অসুস্থ হ'লে কেউ হাসতে পারে? তুমিও এখুনি হাসবে আমার মতো। ভগবানকে ডাকা তোমার সার্থক হয়েছে উমা।...এই ছাখো, একে চিনতে পারো?"

প্যামেলা লঘু-পায়ে ধীরে-ধীরে এগিয়ে যায় মার দিকে।... ত্রস্তে দু'পা পিছিয়ে যান উমাদেবী।

ভিজে-গলায় প্যামেলা বলে, "ব্যাপটিষ্ট আমি হইনি মা, তোমার আদর্শ নিয়ে তোমার মেয়ে আবার তোমার কাছেই ফিরে এসেছি। এবার আমি শুদ্ধ হয়ে যাতে মায়ের উপযুক্ত মেয়ে হতে পারি, আজ তুমি আমায় সেই আশীর্ব্বাদ করো মা।"

এতক্ষণ পরে উমাদেবী দেখলেন, গাউনের বদলে শাড়ী-ব্লাউজ-শ্লিপার-পরা ওঁর সাধের 'যমুনা' প্রণাম ক'রে উঠে জলভরা চোখে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে অপলকে, একটা আশ্বাসবাণী শোনবার অধীর আগ্রহে...

দুটি ব্যগ্র-ব্যাকুল হাত বাড়িয়ে যমুনাকে বুকে টেনে নিলেন উমাদেবী।

তিন মাস পরের কথা।

স্বপক্ষ ও বিপক্ষ তুটি দল তৈরী ক'রে মনের অন্ধকারে ছেড়ে দিয়ে তাদের বাক্‌যুদ্ধের ফলাফল পরীক্ষা করছিল শুভ্রজা ওর শোবার ঘরের আলো নিবিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে···

প্রথমেই স্থুরু হলো ওর মায়ের কথা ঃ

···মা তাঁর বিলাস-প্রসাধনের বহ্বাড়ম্বরে নিজেকে সাজিয়ে রাখুন সর্ব্বক্ষণ, তাতে তোমার কি? সন্তানের কাছে মা চিরদিনই মমতাময়ী মা। ধরো, তোমার মা মণিকা গাঙ্গুলী··· কি অন্যায় করেছেন তিনি? বালবিধবা মেয়ের আবার বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন, এই তো। তার মধ্যেও কি মেয়ের ভবিষ্যৎ শুভাশুভের দায়িত্ব ছিল না তাঁর কিছু?···

বিপক্ষ-পক্ষ বললে, ছিল না আবার? তা খুব ছিল। কিন্তু মনের অগোচর পাপ নেই। তুমি তোমার বুকে হাত দিয়ে বলো তো লক্ষ্মীমেয়ে, আজ যদি তুমি তোমার মায়ের ইচ্ছে পূর্ণ ক'রে এই সোমত্ত বয়েসে মন নিয়ে এমন ছিনিমিনি না খেলতে, তাহলে কি আর জীবনযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হতে হতো তোমায় কোনোদিন?···

স্বপক্ষ বললে, পাপ? মুখ সাম্‌লে কথা কও। পাপ তুমি দেখলে কোথায় আমার? আবাল্য ব্রহ্মচারিণী আমি—

বাধা দিয়ে বিপক্ষ-পক্ষ বললে, থামো থামো।…ব্রহ্মচারিণী না ছাই! ওসব বাঁধা-বুলি উপন্যাসের পাতাতেই লেখা থাকে। বাস্তবে ওর অস্তিত্ব নেই কিছু। যতই হবিষ্যি করো আর বাইরের শুচিতা বাঁচিয়ে অহঙ্কার ক'রে বালবৈধব্যের বড়াই করো…তুমি কে গা, যে, প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম উল্টে দেবে? বয়েসের বুঝি একটা ধর্ম্ম নেই? ধর্ম্মটা শুধ্ তোমারই একচেটে—না? একটু সাবধান হয়ে কথা বলো।…

স্বপক্ষ বললে, কেন, কি এমন অন্যায় কাজ করিছি আমি যাতে ধর্ম্মচ্যুতা হয়ে গেলেম তোমার কাছে?…

বিপক্ষ-পক্ষ বললে, না, অন্যায় এখনো তেমন কিছু হয়নি। চালিয়ে যাও তুমি যেমন চালাচ্ছো শুধ্ উপকারীর প্রত্যুপকার করবার জন্যে নিরালা-নির্জ্জনে ব'সে ভদ্রতা আর শুচিতা বাঁচিয়ে যতটা পারো বন্ধুর সঙ্গে…কিন্তু সব সময় তোমার ঐ দেয়ালে-টাঙানো স্বামীর প্রতিমূর্ত্তিকে সাক্ষী রেখে চোলো, তাহলেই তোমার ধর্ম্ম ঠিক বজায় থাকবে।…

স্বপক্ষ বললে, স্বামীর কথা যখন তুললে তখন এবার আমার হক্ কথা বলতে হয়। দূর তীর্থ-যাত্রার পথে প্রবাসী-যাত্রীদের মতো 'চটি'তে একটা রাত্রি বাস ক'রে—'প্রভাতে দশ দিকচ্ছস্তি কাকস্য পরিবেদনা'—কে কোথায় যে ছিট্‌কে পড়ে ভোরের দিকে…সারা জীবনেও আর তাদের মধ্যে দেখা হয় না একজনের সঙ্গে আর-একজনের। স্বামীর সঙ্গে আর আমার কতটুকুই-বা পরিচয় হয়েছিল বলো?…

বিপক্ষ-পক্ষ এবার আপস করবার চেষ্টা করলে, বললে, এই তো লক্ষ্মীমেয়ের মতো কথা। এবার পথে এসে হাতে হাত মেলাও ভাই···

এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার মৃদু শব্দ হলো।

শুভ্রজা ব'লে উঠলো, "কে ?" বলেই সুইচ টিপে ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিলে।

পরিচিত স্বর শুনে বাইরে থেকেই সুব্রত বললে, "আমি সুব্রত। আচ্ছা থাক্। বুঝিছি আপনি বিশ্রাম করছেন, আর-একদিন আসবো, আজ যাই আমি।"

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে শুভ্রজা বললে, "না না, এত কষ্ট ক'রে এসে ফিরে যাবেন না, আমারো কিছু বলবার আছে আপনাকে, তার জন্যে তৈরী হয়ে আছি আমি···ব'সে যান একটু।"

সুব্রত এসে বসতেই আজ আর কোনোরকম ভণিতা না ক'রে শুভ্রজা বললে, "দেখুন, বিপদের দিনেই লোকের বন্ধুর প্রয়োজন হয়। একদিন আমার বিপদের এক সঙ্গিণ মুহূর্ত্তে অযাচিত ভাবে এসে আপনি আমার যা মান রেখেছিলেন তা অবিস্মরণীয়। আমারো কর্ত্তব্য, সাধ্যমত আপনার সম্মান রক্ষা করা, কিন্তু মেয়ে আমি তেমন আর কি করতে পারবো বলুন! অনেক ভেবে আমি স্থির করেছি, আমার বিবাহের যৌতুকের দরুন যে একরাশ টাকা অকারণে আমার বোঝা হয়ে আছে, আপনি অনুগ্রহ ক'রে কোনো সৎকাজে

লাগিয়ে সেই বোঝাটা অন্তত সামান্য হাল্‌কা ক'রে দেন। দেনার দায়ে আপনার বাবা আজ বিপন্ন···আপনারও এখন এমন রোজগার বা সঞ্চিত কিছু নেই যা দিয়ে আপনার বিব্রত পিতার সে দায় থেকে উদ্ধার ক'রে তাঁর মনে কিছু শান্তি দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন। তাই আমি ঠিক করেছি—"

ড্রয়ার টেনে আগে লিখে-রাখা একখানা আট হাজার টাকার 'বেয়ারার' চেক বের ক'রে শুভ্রজা বললে, "এটা আপনার বান্ধবীর তুচ্ছ স্মৃতি ভেবে গ্রহণ ক'রে যদি আপনি আপনাদের বাড়ীটা কোনোরকমে খালাস ক'রে নিতে পারেন, তাহলে বুঝবো, আপনি আমার যথার্থ বন্ধুর কাজ করলেন।"

অবাক হয়ে গিয়ে সুব্রত বললে, "আপনার এ করুণা অতুলন! আমার জীবনে অশ্রুতপূর্ব্ব! কিন্তু শুভ্রজাদেবী—"

শুভ্রজা বললে, "না, আর আমায় বাড়াবেন না। আমি দেবী-টেবী নই—মানবী। উপকারী বন্ধুর জন্যে মানুষের যা করা উচিত তা থেকে আমায় বঞ্চিত করবেন না, এ সামান্য টাকা আপনাকে নিতেই হবে। ···আরো দেখুন, আপনি যখন সেই উন্মাদ-মেয়েটিকে কিছুতেই বিয়ে করবেন না, তখন এই টাকায় আপনার পিতৃবন্ধুর ঋণ পরিশোধ করলে তাঁরও কিছু দাবি থাকবে না আপনার ওপর! আবার বলছি, আমায় বান্ধবী মনে ক'রে এ টাকাটা আপনাকে নিতেই হবে। কোনো ওজর শুনবো না আজ আমি আপনার।"

"একান্তই না শোনেন যদি আমার কোনো কথা, দিন

তবে। কিন্তু জেনে রাখুন, আগামী-কাল সন্ধ্যের পরেই এ-ঋণ আপনার পরিশোধ ক'রে দিয়ে যাবো। কারণ, কাল আমার হাতে অনেক টাকা এসে যাবে।"

ব'লে কম্পিত-হাতে শুভ্রজার হাত থেকে চেকখানা নেবার সময়—বৈদ্যুতিক-পাখার জোর হাওয়ায় চেকখানা শুভ্রজার করচ্যুত হয়ে স্থানান্তরিত হচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি সেখানা ধরতে যাবে, এমন সময় শুভ্রজার হাতে জোরে হাত ঠেকে গেল সুব্রতর।

শুভ্রজার জীবনে সহসা এই প্রথম অপর-পুরুষের ছোঁয়া লাগতেই চম্‌কে উঠলো ওর সারা দেহটা। ওর যৌবন-সমাগমের মধ্যে কোনো সুস্থ যুবকের স্পর্শ তো ও পায়নি কোনোদিন এর আগে। না পেলেও, জ্ঞান-চর্চ্চায় প্রথম পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রী সংযমসিদ্ধা শুভ্রজার মন এত ঠুন্‌কো নয় যে, এইটুকুতেই ভেঙে পড়বে…

লজ্জিত সুব্রতর কি মনে হলো সে-ই জানে।

সেই মুহূর্ত্তে শুভ্রজা ভাবলে, কাল যে সুব্রতবাবু টাকাটা শোধ ক'রে দেবেন বলছেন, তাহলে কি সেই উন্মাদ মেয়েটির সঙ্গে ওঁর বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে নাকি? আর তারই দরুন 'অ্যাডভ্যান্স' পাবেন উনি কাল টাকাটা?…

শুভ্রজা আর ভাবতে পারলে না। তাছাড়া ভাববার ওর দরকারই-বা কি সুব্রতবাবুর বিয়ের কথা নিয়ে…

চেকখানা হাতে নিয়ে সুব্রত আর অপেক্ষা না ক'রে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পরের দিন কল্যাণীর টেলিগ্রাম পেয়ে সুব্রত মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লো :

"দাদা,

বাবার এই শেষ সময়ে যদি দেখবার ইচ্ছা থাকে তো পরের ট্রেনেই বাড়ী চলে এসো।

—কল্যাণী"

আর দেরী করা চলে না। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিয়ে, সুটকেশটা গুছিয়ে, ম্যানেজারবাবুকে টেলিগ্রামটা দেখিয়ে সুব্রত চললো শেয়ালদা স্টেশনে।

ঘণ্টাখানেক পরে ট্রেন ছাড়তেই ও ভাববার সময় পেলে··· গতকাল সন্ধ্যের পর শুভ্রজাকে ব'লে এসিছি, কাল আমার হাতে অনেক টাকা এসে যাবে, আপনার এ আট হাজার টাকা ঋণ আমি কালই এসে শোধ দিয়ে যাবো।···যত বুদ্ধিমতীই হোক্ শুভ্রজা, সরল-প্রকৃতির মেয়ে তো! ছেলেদের 'চাল' বুঝতে ওদের এখনো ঢের দেরী। আজ সন্ধ্যের সময়েও যার পুঁজি নেই কিছু, কাল সকালে সে কোথায় পাবে আট-হাজার টাকা? ···পাবে, পাবে! খুব সোজা উপায়েই পাবে অত টাকা। সে টাকার ব্যবস্থা তো শুভ্রজাই ক'রে দিয়েছে।

তার 'বেয়ারার' চেকখানা ভাঙিয়ে ক্যাস্ ক'রে সেই টাকাতেই ঋণ শোধ ক'রে আসবে ও শুভ্রজার। কিন্তু···

ছি ছি, এ কি? মৃত্যুপথযাত্রী পিতাকে শেষ দেখা দেখবার জন্যে যে ছুটে চলেছে তার কি—যত সুন্দরীই হোক্ শুভ্রজা···

ধিক্কার দিলে সুব্রত নিজের মনকে।

ভরা-দুপুরের প্রচণ্ড রোদের তাত সহ্য ক'রে ঘর্ম্মাক্ত সুব্রত বাড়ীতে ঢুকে বড়-ঘরের বারান্দায় উঠেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে চেয়ারে ব'সে আছেন যতীন্দ্রনাথ, কল্যাণী বাবার পাশে ব'সে তাঁর কঙ্কালপ্রায় বুকে ধীরে-ধীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, আর পালঙ্কের ওপর মাথার কাছে ব'সে আশ্চর্য্য।··· গঙ্গোত্রী বাবার মাথায় টেনে-টেনে আস্তে-আস্তে হাতপাখার বাতাস করছে।

সুব্রতর মনে হলো এ যেন তার নিজের বাড়ী নয়··· অনাহুত ভাবে সহসা ঢুকে পড়েছে পরের বাড়ীতে।

যতীন্দ্রনাথ ইসারা ক'রে সুব্রতকে ডেকে কাছে বসিয়ে চুপিচুপি বললেন, "এইমাত্র তোমার কথা জিগেস ক'রে বাবা ঘুমিয়ে পড়েছেন। যাও, মুখ-হাত ধোওগে তুমি।"

চোখ বুঁজে নিঃশব্দে শুয়ে আছেন মনোহর। দেখে মনে হয় না উনি বেঁচে আছেন।

কল্যাণী মুখ ফিরিয়ে বাঁ-হাতে চোখের জল মোছে···

বিস্ফারিত-চোখে চেয়ে থাকে গঙ্গোত্রী সুব্রতর মুখের পানে···
হাতের পাখা থেমে যায়।

দাদাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে উদ্গত অশ্রু চেপে কল্যাণী বললে, "বাবার জ্ঞান হলেই কাকাবাবু তোমায় খবর দেবেন, এইবেলা তোমায় কিছু খাইয়ে দিতে বললেন তিনি। কে জানে এরপর আজ তুমি খেতে পাবে কি না—যেরকম অবস্থা দেখছি বাবার—"

আর বলতে পারে না কল্যাণী।

মর্ম্মভেদী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুব্রত একচুমুকে প্রায় ঠাণ্ডা চা এক গেলাস খেয়ে উঠে গেল বাবার ঘরের দিকে।

ডাক্তার ইঞ্জেকৃশান্ দেয়ার কিছু পরে লুপ্ত জ্ঞান ফিরে আসতেই ঘোলাটে-চোখে এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে মনোহর বললেন কল্যাণীকে, "এখনো আসেনি সুব্রত?··· আমার সু?"

মুখের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে অশ্রুসিক্ত চোখে সুব্রত বললে, "এই যে বাবা, এসিছি আমি। আমার দিকে চান্?"

আর কি অশ্রু থাকতে চায় চোখে জমাট হয়ে···

···"আ-আ-আ! এসিছিস্ সু?"—শ্লেষ্মা-জমা গলায় মনোহর বললেন, "কৈ, তোর হাতটা কৈ?"

শীর্ণ কম্পিত হাতখানা মনোহর আর তুলতে পারেন না।

বাবার হাতের ওপর হাতখানা রেখে সুব্রত বললে, "বলুন বাবা, আদেশ করুন আমায় কি করতে হবে?"

বাবার রোগপাণ্ডুর মৃত্যুমলিন মুখে ভাসা-হাসির আভাস দেখা গেল শুধু—"আদেশ? হ্যাঁ, আমার আদেশ আর ইচ্ছে, তোর কাকাবাবুর ঋণ পরিশোধ করতে হবে তোকে।...গঙ্গাকে আমি তোর হাতে সঁপে দিয়ে গেলুম। কৈ, গঙ্গা?...গঙ্গা?"...

আনন্দের আতিশয্যে সামর্থ্যের চেয়ে বেশী জোরে গঙ্গাকে কাছে ডাকতে-ডাকতে মনোহরের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন সহসা থেমে গেল।...

'ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে'—তার জন্যে নয়, সকলকেই যেতে হবে একদিন, কিন্তু যে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে চলে গেলেন মনোহর ওঁর যোগ্য-সন্তানের ওপর নিশ্চিত ভরসা রেখে, সে অসমাপ্ত আশা কি পূর্ণ হবে মনোহরের স্বর্গত-আত্মার, সুব্রতর মত যোগ্যতম শিক্ষিত ছেলেকে দিয়ে?...

"বাবা গো! ব'লে কল্যাণী মৃত-পিতার বুকের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লো...

সজল চোখে চেয়ে রইলেন যতীন্দ্রনাথ মৃত-বন্ধুর মুখের দিকে।

...বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্যে গঙ্গাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন ওঁরা 'ডেরি-অন্-শোন'-এ, এই মনোহরই পত্র লিখে বাধা দিয়ে সপরিবারে আনিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথকে দেশের বাড়ীতে ওঁর 'যতীন্দ্র-ভবন'-এ।...'অন্যত্র চেঞ্জে না গিয়ে নিজের বাড়ীতে আসুন যতীন্দ্রনাথ, এও কি কম স্বাস্থ্যকর জায়গা? এখানে এলেই গঙ্গোত্রী তার নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরে পাবে।'...পাচ্ছিলোও

তাই, কিন্তু মনোহর চোখে দেখে যেতে পারলেন না কিছুই। সব আশাই তাঁর মনে রয়ে গেল। আপসোস!

কিন্তু অত কথা ভাববার সময় নেই এখন যতীন্দ্রনাথের। কঠোর কর্ত্তব্য ওঁর সামনে।... রতন দাসকে ডেকে বললেন, "মোটর নিয়ে কলকাতায় গিয়ে বোম্বাই খাট, বেশী ক'রে ফুল আর একটা নাম-সংকীর্ত্তনের দল নিয়ে আমার কলকাতার 'স্টেশনওয়াগন'-এ যাতে সন্ধ্যের আগে ফিরতে পারো সেই চেষ্টা করোগে, যাও।"

এদিকে বাড়ীসুদ্ধ লোককে কাঁদতে দেখে গঙ্গোত্রী বুঝতে পারে না, যে, হঠাৎ এদের হলো কি! মৃত্যু ও ছাখেনি কোনোদিন। ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ ক'রে শুধু চেয়ে থাকে সবার মুখের পানে—এই রে! সবার সঙ্গে বাবাও কাঁদে যে...

যতীন্দ্রনাথ বললেন, "উঠে এসো গঙ্গা, বাড়ী যাও তুমি রতনের সঙ্গে। এখানে আর তোমার থাকবার দরকার নেই।"

গঙ্গা বললে, "বা রে, বাড়ী যাবো কেন? আমায় বাতাস করতে হবে না?"

"তা আবার হবে না? এখন ঘুমুচ্ছেন তোমার জেঠামণি, এইবেলা তুমি বাড়ী গিয়ে ভালো ক'রে সাজগোজ ক'রে এসোগে। আজ সন্ধ্যের সময় ছ'শো লোকের মিছিল বেরুবে...ফুলের বিছানায় শুয়ে জেঠামণি তোমার বৈকুণ্ঠে যাবেন ঘটা ক'রে ওঁর স্বর্গের বাড়ীতে—দেখতে হবে তো? যাও, ওঠো..."

গঙ্গোত্রী উঠে রতন দাসের সঙ্গে মোটরে চলে গেল গ্রামের প্রান্তে ওর বাবার বিরাট প্রাসাদ 'যতীন্দ্র-ভবন'-এ।

* *

শুভ্রজা ভাবছিল, সুব্রতবাবু ভদ্রলোকটি কী যেন!···আজ পর্য্যন্ত ওঁকে ঠিক চেনা গেল না। সেদিন ব'লে গেলেন, কাল সন্ধ্যের পর এসে টাকাটা শোধ দিয়ে যাবো, তারপর তো কেটে গেছে আড়াই মাস, অথচ দেখাই নেই তাঁর। কেই-বা তাঁকে বলেছিল, টাকাটা কালই চাই, আর তাঁরই-বা উপযাচক হয়ে এ-কথাটা আগে থেকে জানিয়ে যাবার কি দরকার ছিল বুঝলেম না। কলেজ থেকেই দেখে আসছি, ছেলেদের 'নেচার' সবার প্রায় ঠিক এক রকমই হয়। উনিও এসে গেছেন সেই লাইনে। তবে পার্থক্য এই যে, লাইনে এলেও উনি 'কিউ' দিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন শৃঙ্খলা বজায় রেখে পাশ্চাত্যের ট্রাম-বাস যাত্রীদের মতো 'এ্যারিষ্টোক্র্যাটিক্' চালে। কিন্তু কি হবে আমার টাকা? টাকার কথা তো নয়, কোনো ভদ্র-ছেলে যদি কথা দিয়ে যান আসবার, অপেক্ষা করতে হয় তো তাঁর জন্যে! যতই মনে করি সুব্রতবাবুর সঙ্গে আর সংস্রব রাখবো না কিছু, তাঁর প্রতি আমার কর্ত্তব্য পালন করতে পারলেই আমার ছুটি হবে, সে উদ্দেশ্য দেখছি

সফল হতে দেবেন না তিনি···ভাবিয়ে তুলবেনই ঠিক একটা না-একটা তুচ্ছ ব্যাপারের ভেতর দিয়ে···

প্যামেলার যে চিঠিখানা পড়বার জন্যে হাতে ক'রে নিয়ে শুভ্রজা এতক্ষণ এইসব কথা ভাবছিল, এখন এ চিন্তা স্থগিত রেখে খাম ছিঁড়ে সেখানা বের করলে।

প্যামেলা লিখেছে :

"বাবা-মার সঙ্গে এ-দেশ সে-দেশ বেড়িয়ে বেশ আনন্দেই কেটে যাচ্ছে দিনগুলো আমার। জানো শুভ্রা, এর মধ্যে একটা ব্যাপার দেখে খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেলেম—মজ্জাগত সংস্কার মানুষের মনে আজো এমন বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, বর্ত্তমান শিক্ষা সভ্যতা কৃষ্টি আদিমযুগের সেই কুসংস্কারকে এখনো এড়িয়ে যেতে পারেনি।

আমাদের 'রুমা'র কথা তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে··· অতি 'আপ-টু-ডেট্' মেয়ে, সেই যে তোমার সঙ্গে বি-এ পাস করেছিল। কত ছেলেই যে সেই 'আলট্রা-মডার্ণ' মেয়েটিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। সে ছিল সব ছেলের চোখে একটিমাত্র মেয়ে। সে করেছিল কি জানো? বাপ-মায়ের সম্পূর্ণ অমতে বিয়ে করেছিল এমন একটি দরিদ্র ছেলেকে, যার না আছে বংশমর্য্যাদা, না আছে রূপ, স্বাস্থ্য, উচ্চ শিক্ষা—অর্থাৎ তার উপযুক্ত পাত্র বলতে যা বোঝায় তার কোনোটাই।

সেই রুমাকে সেদিন দেখলেম, বেনারসের এক ভাঙা

একতলা বাড়ীর ছাতে কাপড় শুকোতে দিচ্ছে দড়িতে। ঢুকলেম তার সঙ্গে দেখা করতে সেই বাড়ীর মধ্যে।···স্বামী পড়ে আছে রোগশয্যায়···রুমা শুধু তার সেবাই করে না, সংসারের রান্নাবান্না, বাসনমাজা সবই সে ক'রে যায় নিজের হাতে হাসিমুখে। আমায় বললে, তুমি অবাক হয়ে যাচ্ছো প্যামেলাদি—না? কিন্তু এ-কাজ যে আদিমযুগ থেকে আমাদেরই।···

উল্কা লক্ষ্যহীন পথে ঘুরতে-ঘুরতে এক কেন্দ্রে স্থায়িত্ব লাভ করেছে তাই কেন্দ্রের প্রতি তার আকর্ষণ অস্বাভাবিক। মাত্রা যে ছাড়িয়ে যাচ্ছে সে-খবরে তার প্রয়োজন নেই, কারো নিন্দা-প্রশংসা সে গ্রাহ্যও করে না।···

পনেরো দিন পরে ফেরবার পথে আবার বেনারসে নেমে রুমার খবর নিতে গিয়ে দেখলেম, ঘর শূন্য। রুমাও নেই, রুমার স্বামীও নেই। বাড়ীউলী বললে, সাত দিন আগে রুমার স্বামী মারা গেছে। আর রুমা? মৃত-স্বামীর মাথা কোলে নিয়ে রুমা সেই যে বসেছিল, তারপর ওঠেনি আর। 'মণিকর্ণিকা'র শ্মশানে পাশাপাশি চিতায় দুটি দেহই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।···

যে রুমা একদিন সীতা-সাবিত্রী-বেহুলার কথায় নাক সেঁটকাতো, সে কি ক'রে তাদের আদর্শ মেনে নিলে আমি তাই ভাবছি, আর তোমার কথাও ভাবছি, যে, চলার পথে কি তুমি পেলে শুভ্রা, কতটুকু কুড়োলে যা সম্বল ক'রে

জীবনের বাকি দীর্ঘ-পথের পাথেয়ের জন্যে তোমায় আর ভাবতে হবে না কখনো।

আমার দৃষ্টিভঙ্গী বদ্‌লে গেছে। তোমাদের আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ভাই, আমার জীবন আমি এমনি বন্ধনহীন ভাবেই কাটিয়ে যাবো—আমার জন্যে শুধু সেই প্রার্থনাই কোরো, আমি যেন সবার কাজ ক'রে যেতে পারি। অনেক ভুল করেছি, তার জট খুলতে পারি যেন। দেশের মেয়ে হয়ে সেই দেশেরই কিছু জানিনে, আজ সেই অজ্ঞতাই আমার বিরাট লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে ভরসা এই যে, মা আমার সব ভুলই আস্তে-আস্তে শুধরে দিচ্ছেন। ভালবাসা নিও। ইতি।

—প্যামেলা"

ভুল ভেঙেছে প্যামেলার। ঘর চিনতে না পেরে সে অনেক দূরে চলে গেছলো, আবার ফিরে এসেছে।

টেবলের ওপর চিঠিখানা চাপা দিয়ে শুভ্রজা উঠছিল, বাইরে থেকে মতিলালের ব্যগ্র-কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "দিদিমণি ঘরে আছেন তো? ভয়ানক খবর আছে একটা।"

ভয়ানক খবর!

উৎকণ্ঠিতা হয়ে ওঠে শুভ্রজা···"কী এমন ভয়ানক খবর মতিলাল? ভেতরে এসো।"

"ভয়ানক নয়? এর চেয়ে ভয়ানক খবর আর কি হতে পারে? আমাদের সুব্রতবাবু—অর্থাৎ সুব্রত মিত্রের বিয়ে

হয়ে গেল যে ! উঃ, কী ভয়ানক বেইমান ।···ভদ্রলোক একটা খবর পর্য্যন্ত দিলেন না ? ছি ছি ছি ।···

শুনে শুভ্রজা সাড়াও দিলে না, জিগেসও করলে না কিছু যে—কবে কোথায় কার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলো, বা পাত্রী কে ।

শুভ্রজাকে নির্ব্বাক থাকতে দেখে মতিলাল ব'লে চললো—"শুনে আপনার হাসি আসবে দিদিমণি, যে, একটা পাগলীকে বিয়ে করেছেন সুব্রতবাবু। টাকার জোরে কি না হয় ? তাঁর বাবা মনোহর মিত্রের নাকি দেনা ছিল বন্ধু যতীন বোসের কাছে, তিনি মরবার সময় তাই সুব্রতবাবুর হাতে বন্ধুর সেই পাগলী মেয়েটাকে সঁপে দিয়ে ঋণমুক্ত হয়ে চলে গেছেন ভবপারে ।"

বাকি কথা আর বলতে না দিয়ে মতিলালকে, এতক্ষণ পরে শুভ্রজা কথা কইতে পারলে, বললে, "মারা গেছেন সুব্রতবাবুর বাবা ?"···

মতিলাল বললে, "তবে আর বলছি কি দিদিমণি ! জানেন তো, আমি কত শ্রদ্ধা করি তাঁকে ; আর আপনার কথা বাদ দিন, আপনার দয়াতেই তো তিনি খেয়ে-প'রে বেঁচে আছেন এ্যাদ্দিন, নইলে কবে পটল তুলতেন—"

"কি সব নোংরা কথা কইছো তুমি মতিলাল ?" ···শুভ্রজা বললে, "আমাদের বাড়ীতে এতদিন কাজ ক'রে, কোনো ভদ্রলোকের প্রসঙ্গ উঠলে কেমন ক'রে তাঁর সম্মান বজায় রেখে কথা কইতে হয় তাও শেখোনি ?"

লজ্জিত-সঙ্কোচে মতিলাল কথা ঘুরিয়ে নিলে, বললে, "আজ্ঞে দিদিমণি, সে-কথা নয়। আমি বলছিলাম, বাপ মারা গেলে একবছর 'কালাশৌচ' পালন করতে হয় এই তো জানি। কিন্তু তিনমাস যেতে না-যেতে...পুরোহিত মন্ত্র পড়লে কি না পড়লে, একেবারে বিয়ে হয়ে গেল! আর একটা বদ্ধ পাগল মেয়েকে বিয়ে ক'রে তিনিও এমন উন্মাদ হয়ে গেলেন যে, আপনাকে একটা খবর পর্য্যন্ত দিলেন না, আমি তাই ভেবেই বলেছি ও-কথা।"

বিরক্ত হয়ে শুভ্রজা বললে, "কি দরকার তোমার বা আমাদের তাঁর বিয়ের কথা নিয়ে ভাববার? কে তিনি আমাদের যে, চব্বিশ ঘণ্টা শুধু তাঁর কথা, তাঁর বিয়ের কথা নিয়ে ভাবতে হবে আমাদের! বাজে কথা নিয়ে এমন মাথা বকাও তুমি, যে, মানুষের মাথার ব্যামো ধরিয়ে দাও। বেশ বসেছিলেম, তোমার সঙ্গে ব'কে আমার মাথা ধ'রে গেল!"...ব'লে রগ দুটো দু-হাতে টিপে ধ'রে ব'সে রইলো মিনিটখানেক, তারপর গায়ের নিমায়-আঁটা ফাউণ্টেনপেনটা বুক থেকে বের ক'রে নিয়ে লেটার-প্যাডে খস্‌খস্ ক'রে কি লিখে মতিলালকে বললে, "কাছাকাছি যে ফার্ম্মেসী বা ষ্টোর পাবে, এই ওষুধটা চট্ ক'রে এনে দাও, দেরী কোরো না। 'ভিক্‌স্' 'স্মেলিংসল্ট' 'সারিডন', এর মধ্যে যেটা পাও—আচ্ছা, সব কটাই নিয়ে এসো। যাও।"

মতিলাল চলে গেল টাকা আর ওষুধের ফর্দ্দ নিয়ে।

এতক্ষণ পরে দুপুরে সই-ক'রে-নেয়া সুব্রতর রেজেষ্ট্রী-কভারটা খোলবার সময় হলো শুভ্রজার। সময় ঠিক নয়, যথেষ্ট সময় ছিল এতক্ষণ, কিন্তু সুব্রতবাবুর চিঠিখানা বেশ শান্ত মনে মাথা ঠাণ্ডা রেখে পড়বে ভেবেছিল। কিন্তু ও ভাবলে কি হবে, 'ম্যান্ প্রোপোজেস্ গড্ ডিস্‌পোজেস্' ব'লে যে প্রবাদটা আছে, সেটা ওর ভাগ্যে অক্ষরে-অক্ষরে মিলে গেল এখন। মাথা-ধরার এই অসহিষ্ণু অশুভ-মুহূর্ত্তে এ-চিঠির মধ্যে যে কোনো অকরুণ কাহিনী ওর মর্ম্মপীড়ার কারণ হবে না তাই বা কে বলতে পারে!

ভাবতে-ভাবতে মাথার ভেতর যে কি যন্ত্রণা হতে থাকে!—

সেই অবস্থাতেই কভার ছিঁড়ে চিঠিখানা বের ক'রে শুভ্রজা দেখলে, শুধু চিঠি নয়। চিঠির ওপর পিন্ দিয়ে গাঁথা রয়েছে ওরই দেয়া সেই আট হাজার টাকার চেকখানা!

সুব্রতবাবু লিখেছেন:

"নমস্কার শুভ্রজাদেবী।

আজ আর বলতে লজ্জা নেই যে, কথার খেলাপের লজ্জায় আপনার কাছে মুখ দেখাতে না পেরে আমায় নিজের বাড়ী ত্যাগ ক'রে বাস করতে হচ্ছে এখন 'মথুরাপুরী'তে।

পিতৃসত্য রক্ষা করবার জন্যে শ্রীরামচন্দ্র বনে গিয়ে হারিয়েছিলেন তাঁর সীতাদেবীকে···পিতার অন্তিম-আদেশ পালন আর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করতে, চলার পথে আমি কুড়িয়ে পেয়েছি এক উন্মাদিনী বালিকাকে। জীবনের শেষ লক্ষ্যস্থানে

পৌঁছোবার বাকি দীর্ঘ কণ্টকাকীর্ণ-পথে এরপর কি ক'রে যে তাকে টেনে-টেনে নিয়ে যাবো !...

গোড়াতেই জানিয়ে রাখছি, দৈববশে বা ভাগ্যদোষে আজ আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হয়ে পড়েছি। হাজার-হাজার টাকার চেকের তলায় মালিক হিসেবে এখন আমায় নাম সই করতে হয়। কিন্তু ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে সারাদিন মানুষের দ্বারে-দ্বারে ঘুরে যখন শ্রান্ত অবসন্ন দেহে আমায় রিক্ত-হাতে শূন্য ঝুলি নিয়ে ফিরতে হতো, সে দুর্দ্দিনে দু-হাত ভ'রে আমার শূন্য ঝুলি পুর্ণ ক'রে যিনি আমায় রক্ষা করেছিলেন, সেই আপনাকে আমার নিজের সই-করা আট হাজার টাকার চেক পাঠিয়ে ঋণ পরিশোধ করবার অহঙ্কার দেখিয়ে অমর্য্যাদা করতে পারলুম না, তাই আপনার সই-করা চেকটাই 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা' করার মত পাঠিয়ে দিলুম আপনাকে। অপরাধ আমার পদে-পদে। এটাও যদি অপরাধ ব'লে গণ্য হয় তো পরে শাস্তি পাবো।...পরে কেন, এখনই কি কম শাস্তি পাচ্ছি? যাক্, পত্র আর দীর্ঘ করবো না, কিন্তু জেনে রাখুন, যে-কথা উচ্চারণ করতে শাস্ত্রের মানা...এজন্মে আর জানাতে পারবো না আপনাকে সে-কথা, এই তো আমার পক্ষে পরম এবং চরম শাস্তি।...

তবে এটাও সত্য যে, বাইরের শাস্ত্র ছাড়া আমার অন্তরেরও একটা শাস্ত্র আছে আর সেই শাস্ত্রের পাতায় বুকের-রক্তের আখরে যা লিখে রেখেছি একান্ত গোপনে, সেটা ভাষায় প্রকাশ

করলে কোনো পাপই স্পর্শ করতে পারবে না আমায়। সেটা হচ্ছে এই—এক-মাতৃস্তন্যপায়ী ছুটি শিশুর রক্তের সম্বন্ধ নিয়ে যে আত্মীয়তা, সেই সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে আজ অকপটে জানিয়ে রাখলুম যে, আমি তোমায় ভালোবাসি শুভ্রজা। যদি কখনো তেমন দিন আসে, তোমার আগে আমায় বিদায় নিতে হয় তোমাদের কাছ থেকে—আর কিছু নয়, মমতায় দু-ফোঁটা অশ্রু উপহার দিও আমার উদ্দেশে—সে অশ্রুই হবে আমার পরম সান্ত্বনা, আর তাহলেই আমার তৃষ্ণার্ত্ত আত্মার পরিপূর্ণ তৃপ্তি হবে। আমার ভালোবাসা নিও···

অকৃতজ্ঞ সুব্রত।"

অন্য কোনো মেয়ে হ'লে অবাক হতো···আশ্চর্য্য হয়ে অনেক কিছুই ভাবতো, কিন্তু সর্ব্বংসহা উচ্চশিক্ষিতা শুভ্রজার ওসব কিছুই হলো না। ও শুধু ভাবলে, এই ভালোবাসাটা কি? এটা কোনো বস্তু নয় যা দু-হাতে আঁকড়ে ধরা যায়, অথচ বাতাস যেমন মুঠো ক'রে ধরা যায় না, কিন্তু বুঝিয়ে দিয়ে যায় আমি আছি, এও ঠিক সেইরকম। আছে শুধু মানুষের মনে, কিন্তু ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এর নাম 'ভালোবাসা' না হয়ে যদি 'মায়া' হতো তো সব দিক দিয়েই মানাতো ভালো।

এ শুধু একটা শুকনো ঝঞ্ঝাট···

···কোনো ছেলে তার মনের মতো একটি মেয়েকে ভালোবাসে···একান্তভাবে পেয়েছেও তাকে। আশ্চর্য্য! তবু সে যখন আর-একটি সুন্দরী বা অপরের বাঞ্ছিতা কোনো

মেয়েকে ছাখে, তখন তার দিকে হ্যাংলার মতো তাকিয়ে থাকে··· আগের মেয়েটিকে গোপন ক'রে সেই মেয়েটিকে যে কত আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা জানায়···তাকেও বলে তোমায় ভালোবাসি।···

মেয়েরা কিন্তু মোটেই সেরকম নয়। তবে বস্তির মেয়ে থেকে রাজরাণী পর্য্যন্ত সকলেই যদি একবার জানতে পারেন কোনো পুরুষ তাঁকে ভালোবাসে, আর সেই ভালোবাসার পাত্রটি যে কোনো কারণে তাঁর সামনে আসছে, সব দিক থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রেখে তিনি আর-কিছু না হোক্, অন্তত নিজেকে একটু 'ফিট্‌ফাট্' ক'রে তখন তাকে দেখা দেবেন এ-কথা আমাদের দেশের অসংখ্য মহামনীষী আর পাশ্চাত্যের সে-যুগের 'সেক্সপীয়র' থেকে সুরু ক'রে এ-যুগের অদ্বিতীয় মনস্তত্ত্ববিশ্লেষ্টা 'বার্ণার্ড শ' পর্য্যন্ত প্রত্যেক একডাকে-চেনা পণ্ডিতের লেখা গ্রন্থে প'ড়ে দেখেছে শুভ্রজা।

সুব্রত আমায় ভালোবাসে আর তার বিনিময়ে আমার ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ সে চেয়েছে আমার কাছ থেকে উপহার ছু-ফোঁটা অশ্রু। অথচ যে আত্মীয়তার কথা প্রকাশ ক'রে লেখনী থেমেছে তার, তাতে তাকে দোষ দেবে এমন মানুষ পৃথিবীতে কেউ জন্মায়নি আজো। কিন্তু চোখে অশ্রু থাকলে তো? সারা দেহটাই যার এজন্মের মতো পাথর হয়ে গেছে সে অশ্রু পাবে কোথায়?···

মন বলে—শুভ্রজা, তুমি এত জানো, আর এটা কেন জানো না, যে, বিচিত্র রহস্যভরা এই পৃথিবীর পুঞ্জীভূত বেদনার

অশ্রু জমে যে পাথরের সৃষ্টি হয়েছে, সেই কঠিন পাথর ভেদ করেই বেরিয়ে আসে অফুরন্ত নির্ম্মল নির্ঝরিণী। তার চেয়ে তুমি বলো, ওগো বন্ধু, তাই হবে। তুমি যা চেয়েছো, সেই সম্বোধনই করবো তোমায় এরপর থেকে।

মনের এ পরামর্শ মাথা পেতে নিলে শুভ্রজা।

নারী-মনের চিরন্তন সহজাত সংস্কার।

এদিকে দক্ষিণ-কলকাতায় এলগিন রোডে সেনসাহেবের বাগানবাড়ীতে যখন মনস্তত্ত্বের এইরকম লীলাভিনয় চলছিল, ওদিকে উত্তর-কলকাতায় শ্যামবাজারে জমিদার যতীন্দ্র বসুর প্রাসাদে একটি উজ্জ্বল দৃশ্যের পটভূমিকায় তখন দোতলার বারান্দায় রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে তরুণী গঙ্গোত্রী।

নিশীথিনী নিস্তব্ধ। বেগুনী-রঙে ছাঁকা চূর্ণ-বিচূর্ণ রক্তনীলের স্বচ্ছ তুষারকণায় আকাশ গঙ্গা ভরিয়ে-তোলা আজকের এই জ্যোৎস্নার পরিবেশে কোন্ অসীমের ধ্যানে তন্ময় হয়ে দূর দিগন্তের পানে তাকিয়ে আছে গঙ্গোত্রী ও নিজেই জানে না, তা অন্যে বলবে কি ক'রে!

সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছিল সুব্রত। যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাণীগঞ্জের কোলিয়ারীতে গিয়ে ফেরার পথে মোটরের কল বিকল হয়ে যাওয়ায় আসতে রাত হয়ে গেছে অনেক।

যতীন্দ্রনাথ বাড়ীতে এসেই চলে গেছেন নিজের মহলে···

সুব্রত আসছে দোতলায় ওর নিজের ঘরের দিকে অন্দরের বারান্দার পাশ দিয়ে।

সহসা থম্‌কে থেমে গেল সুব্রত, তফাত থেকে গঙ্গোত্রীকে দেখে। এত রাত্রে একা গঙ্গা দাঁড়িয়ে ওখানে!...

হয়তো এইরকম করেই সারা রাত বাড়ীময় ঘুরে বেড়ায় ও। বিয়ের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত চন্দ্রিমাদেবী হাজার চেষ্টা করেও দিতে পারেননি গঙ্গাকে ওর ঘরে, এ-কথা তো আর ওকে জানতে হবে না অন্যের কাছে। দুর্দ্দৈব আর কাকে বলে?...

কিন্তু সে-কথা পরে। এখন কি দেখছে সুব্রত? দেখবার চোখ নিয়ে তো আর গ্যাখেনি এর আগে কোনোদিন গঙ্গোত্রীকে আজকের মতন এমন ক'রে! ওর মুখের সামনে বিশ্ব জুড়ে ফিনিক ফু'টে আছে চাঁদের আলো...পেছনে বারান্দার ব্র্যাকেটে জ্বলছে সবুজ রঙের 'ফ্লোরা' বিজলী-বাতি। সত্যি, নিসর্গসুন্দরী ওর স্ত্রী ওই গঙ্গোত্রী। এইরকম মেয়েকে নিয়ে কাব্য রচনা করলে তাতে নিশ্চয়ই লিখতে হবে যে, ডানা বাদ দিয়ে কোনো পরী যেন তার পরীস্তান থেকে নেমে এসে রূপ নিয়েছে মানুষের, ওর চোখের সামনে। ...তার ওপর আরো সুন্দর মানিয়েছে বাঁদিকের চিবুকের পাশের ভ্রমর-কালো ঐ কৃষ্ণতিলটুকু—'বিউটি-স্পট্'...

কিন্তু...

ঐ 'কিন্তু'তেই তুমি নিজেকে সব রকমে বঞ্চিত করেছো

সুব্রত, তবু এখনো তোমার 'কিন্তু'কে তুমি মন থেকে সরাতে পারলে না···

'কিন্তু' আর কি? শুভ্রজা। এই তো বলতে চাও তুমি? বেশ তো। মনোনয়নে শুভ্রজাকে রাখো না গঙ্গোত্রীর পাশে···

মোহগ্রস্ত সুব্রত দেখলে, ছ'জনেই অপূর্ব্ব সুন্দরী বটে, তবে গঙ্গোত্রী হচ্ছে কামনার প্রতীক, আর ওর পাশে শুভ্রজা ঠিক আরাধনার উপচার।

গঙ্গোত্রী—বিদ্যুল্লতা। শুভ্রজা···তুষারকণা।

জুতো খুলে হাল্‌কা-পায়ে খুব সন্তর্পণে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গিয়ে সুব্রত যেই গঙ্গার কাঁধের ওপর ওর আল্‌গা হাতটি রেখেছে, আহতা ফণিনীর মত ফোঁস্ ক'রে গর্জ্জে উঠে গঙ্গোত্রী ব'লে উঠলো—"কে?"

সুব্রত বললে, "আমি সুব্রত।"

"সুব্রত আছো আপনার ঘরে আছো। আমার গায়ে হাত দাও তুমি কোন্ সাহসে?"···গঙ্গা রুখে দাঁড়ালো।

সুব্রত বললে, "আমি যে তোমার স্বামী।"

বিশ্বাস করতে পারলে না গঙ্গোত্রী, বললে, "স্বামী না কচু। মা বলেছে, স্বামী দেবতা। আমাদের ঠাকুরঘরে যে লক্ষ্মী-নারায়ণ দেবতার মূর্ত্তি আছে, তারা বুঝি মানুষের মতন কথা কয়? আমি যেন জানি না কিছু।"

ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদবার চেষ্টা করে গঙ্গোত্রী, বলে,

"বাড়ীসুদ্ধু সবাই আমাকে ঠকাতে চায়···যার যা ইচ্ছে হচ্ছে সে তাই ব'লে ঠকাচ্ছে আমায়—দেবতা, স্বামী··· বুঝিয়ে দাও দিকিন্ কেমন ক'রে তুমি আমার স্বামী হ'লে?"

সুব্রত বললে, "তা আর বোঝাবো না কেন? মনে করো, ক'মাস আগে সেই তুমি যখন আমাদের বাড়ী গিয়েছিলে, আমার বাবা—তোমার জেঠামণি তোমার হাতখানা আমার হাতে তুলে দিলেন।···"

"হি-হি-হি-হি-হি···হ্যাঁ। হ্যাঁ।"

ঘাড় দোলায় গঙ্গা, বলে, "মনে পড়ছে বটে···সেই যে সেদিন—না?"

সুব্রত বললে, "হ্যাঁ। এই ছাখো, সেদিন থেকে কাকীমা রোজ তোমার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেন। তারপর এই ছাখো"—

গঙ্গার বাঁ-হাতটা নিজের হাতে নিয়ে সুব্রত বললে, "এই যে হাতে লোহা পরেছো, শাঁখা পরেছো, রুলী পরেছো,—এ-সবই তো বিয়ের চিহ্ন গঙ্গা। আজ কি তুমি অস্বীকার করতে পারো, আমি তোমার স্বামী নই, তুমি আমার কেও নও?"

বাধা দেবার মত আর কোনো জবাব যোগায় না গঙ্গোত্রীর মুখে। ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে সুব্রতর মুখের দিকে।

গঙ্গোত্রীর কপালের ওপরের চূর্ণ চুলগুলো আস্তে-আস্তে সরিয়ে দেয় সুব্রত···

এ তো আর সংজ্ঞাপহারক মস্তিষ্কের স্নায়বিক ব্যাধি নয়, যৌবন-সমাগমের পর পুরুষের প্রথম প্রণয়-স্পর্শ। সারা দেহে শিহরণ জাগে···সহসা সুব্রতর বুকের ওপর মাথা রেখে ওকে জড়িয়ে ধরে গঙ্গোত্রী।

এবার কি বলবে? মন্ত্রশক্তি···পূর্ব্বজন্মের যোগসূত্র··· ভালোবাসা, না মায়া?

যাই বলো, এইখানেই নারীজন্মের পূর্ণ সার্থকতা।

অরগ্যানের সামনে ব'সে আনমনে শুভ্রজা গেয়ে চলেছে:

'জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা—'

সহসা দরজার ওপাশের পিয়ানোর স্বরগ্রামে খাদ থেকে নিখাদে কে যেন বুড়ো-আঙুলের নখের ফলকে একটানা আঘাত করতে-করতে 'ষড়্জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত নিষাদ'কে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেই সেই মুহূর্ত্তে সঙ্গীতের সপ্তস্বরের সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টায় সুরের তরঙ্গ তুললে:

'যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হয়েছে হারা—
জানি গো জানি তাও হয়নি হারা'।

গায়িকার দিকে মুখ ফিরিয়ে শুভ্রজা বললে, "প্যামেলা যে। কখন এলে ভাই ?"

প্যামেলা বললে, "কখন্ নয়, কবে এসেছি জানতে চাইলে তবে এ-প্রশ্নের উত্তর দেয়া আমার পক্ষে সহজ হবে। আমরা নেমেছি—আবুপাহাড় থেকে তোমায় শেষ যে চিঠি লিখেছিলেম, তার তিন দিন পরেই। তাহলে আজ থেকে হপ্তা-দুই আগেই হবে। তারপর, কেমন আছো শুভ্রা ?"

শুভ্রজা বললে, "আমার আর থাকাথাকি—অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন। যাক্, তোমাদের খবর বলো। জেঠামণি, জেঠিমা, তুমি, তোমরা নিশ্চয়ই নতুন স্বাস্থ্য নিয়ে ফিরে এসেছো। কিন্তু এত শীগগির ফিরলে যে ? তোমার আগের চিঠিতে জেনেছিলেম, আরো মাসখানেক থাকবে তোমরা, তারপর রাজপুতানার সব দেখা শেষ ক'রে—"

শুভ্রজাকে থামিয়ে দিয়ে প্যামেলা বললে, "সেইরকমই ইচ্ছে ছিল, হঠাৎ সুব্রতবাবুর চিঠি পেয়ে বাবা বাধ্য হলেন তাড়াতাড়ি নেমে আসতে। অফিসে 'রেজিনেসান্ লেটার' দিয়ে সুব্রতবাবু সে-কথা জানিয়ে বাবাকে আলাদা চিঠি দিয়েছিলেন, সুব্রতবাবুর সেই চিঠি পেয়েই বাবা আর থাকতে চাইলেন না—"

প্যামেলার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শুভ্রজা বললে, "তা নাহয় বুঝলেম, কিন্তু এটা তো ঠিক বুঝতে পারছিনে, যে, বাড়ীতে পৌছেই ফোন্ না ক'রে এতদিন পরে—আর

জেঠামণিও তো কলকাতায় ফেরার কথা এতদিন জানান্‌নি আমাদের।"

প্যামেলা বললে, "সেটা শুধু তোমাকে একটু তাক্ লাগিয়ে দেবো বলেই বাবা-মার পায়ে ধ'রে আমায় করতে হয়েছে। আমিই নিষেধ করেছিলেম তাঁদের খবর দিতে তোমায়। আর-একটা কথা শুনে রাখো, 'কন্‌ভেণ্ট' থেকে ফিরে আসার পর মা আমার মনের গতি বদ্‌লে দিয়েছেন একেবারে। এখন থেকে তুমি আর আমায় 'প্যামেলা' ব'লে না ডেকে, 'যমুনা' ব'লে ডাকবে। আমার মহিমময়ী মা ···মায়ের-দেয়া পবিত্র নাম—যমুনা।"

খুব খুশী হলো শুভ্রজা, যমুনার এ-কথা শুনে।

যমুনা বললে, "এবার কাজের কথা শোনো, যার জন্যে আমায় 'প্যামেলা'র অস্তিত্ব ভুলে তোমার মতো তাপসী হতে হয়েছে। আমি কুমারী, আর তুমি শুচিশুদ্ধা ব্রহ্মচারিণী। এর পর যে-কথা বলবো সেটা হয়তো একটু রসঘন হবে, কিন্তু সে-কথা শুনে তুমি হেসো না যেন।"

শুভ্রজা বললে, "শুনি তো আগে।"

যমুনা বলতে সুরু করলে: "নারী-জন্মের সকল শ্রম-সাধনা সার্থক হয় সন্তানের মা হতে পারলে। কেমন, নয় কি?"

শুভ্রজা মাথা দুলিয়ে সায় দিলে ওর কথায়।

যমুনা বললে, "আচ্ছা, প্রত্যেক মেয়ের কম-বেশী আন্দাজ কতগুলি ছেলে-মেয়ে হওয়া সম্ভব তার জীবনে?"

শুভ্রজা বললে, "জানিনে। ও-সম্বন্ধে আমি ভাবিনি কোনো দিন।"

যমুনা বললে, "কেই-বা ভেবেছে? এটা 'ম্যাথামেটিক্স'-এর আলোচ্য-বিষয় হিসেবেই বলিছি আমি। যাক্, আমি বলছি, যত বেশীই হোক্, পনেরো-কুড়ির মধ্যেই সে-গণনার শেষ হবে। এখন কথা হচ্ছে, আমি কুমারী—কুমারীই থেকে যাবো, কাজেই মা-হওয়া আমার ভাগ্যে নেই, আর তোমাকে তো মা হতেই নেই। হতে না থাকলেও আমরা মায়ের জাতি তো! তাই আমি ঠিক করিছি যে, তোমাতে-আমাতে মিলে এমন কোনো একটা সৎকাজে হাত দেবো, যার ফলে আমরা লাখ-হু'লাখ—এমন কি অসংখ্য সন্তানের মা হয়ে একেবারে 'জগজ্জননী' রূপে জগতে পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করতে পারবো।" ব'লে খুব খানিকটা হেসে নিয়ে যমুনা আবার বলতে লাগলো, "জগতে সংসজ্ঞ সদনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা পরিচালনা করবার জন্মে উদার উচ্চপ্রাণ মহৎ লোকের অভাব নেই। তাঁরা সেই-সব করুন, আমরা মায়ের জাতি শুধু মাতৃসেবার কাজের ভার নিয়েই আমাদের বাকি জীবনের শেষ সোপানে ধীরে-ধীরে ওঠবার চেষ্টা করবো। 'মহাপ্রস্থান' তো একদিন করতেই হবে, সেদিন সেখানে কৈফিয়ত দিতে আর বেগ পেতে হবে না তাহলে। কি করবো জানো? তোমার আর আমার মিলিত-শক্তি দিয়ে একটা 'মাতৃসদন' গ'ড়ে তুলবো মনে করিছি।"

দৃপ্ত হয়ে উঠলো শুভ্রজার মুখ। যমুনার হাত-ছুটো ছু-হাতে

চেপে ধ'রে ব'লে উঠলো, "খুব রাজী আমি। আমার শক্তি সামর্থ্য অর্থ, সব দিয়ে আমি তোমার এই সদিচ্ছা পূর্ণ করবার—"

যমুনা বললে, "থামো। অত উচ্ছ্বসিত হয়ো না। তাহলে সামনের হপ্তা থেকেই আমাদের কাজ সুরু হবে কথা রইলো। এই নাও খাতা, এতে নাম সই করো। কুড়ি হাজার টাকা তোমায় দিতে হবে এ-কাজের জন্যে, আর সে-টাকা প্রয়োজন মতো তুমি নিজের হাতে ব্যয় ক'রে যাবে। যাক্, এতদিন আমাদের আসার খবর দিইনি কেন, এই খাতাটা দেখলেই এখন বুঝতে পারবে।" ব'লে খাতাখানা খুলে ধরলে সে শুভ্রজার অরগ্যানের চাপার ওপর।

পাতা উল্টে দেখতে-দেখতে মুগ্ধ হয়ে শুভ্রজা ভাবলে, যমুনা করেছে কি? হিন্দু, মুসলমান, পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী, বাঙালী, অবাঙালী কেউই যে বাদ যান্‌নি দেখছি এ পুণ্য-প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করতে! হঠাৎ একটা নামের ওপর দৃষ্টি পড়তেই শুভ্রজা মনে-মনে দু'বার পড়লে সেই পাতাটা—সুব্রত মিত্র··· কুড়ি হাজার টাকা!

যমুনা টেনে-টেনে হাসে, বলে, "দেখা করেছিলেম আমি সুব্রতবাবুর সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে। দেখলেম, বিয়ে করবার পর হঠাৎ বড়লোক—"

এইপর্য্যন্ত শুনে দারুণ অনুসন্ধিৎসায় ওর মুখের পানে শুভ্রজাকে চাইতে দেখে চালাক মেয়ে যমুনা বললে, "তুমি যা ভাবছো শুভ্রা, তা মোটেই নয়। দেখলেম, বিয়ের পর

হঠাৎ বড়লোক হয়েও তিনি বদ্‌লান্‌নি এতটুকু। আমাকে যথেষ্ট সম্মান করলেন, বিনয়ে বিগলিত হয়ে তোমার যা প্রশংসা করলেন! শেষে বললেন, 'নমস্কার জানাচ্ছি আমি আমার চিরবান্ধবী শুভ্রজাদেবীকে তাঁর উদ্দেশে আপনার কাছে, এ-কথা তাঁকে না জানালেও চলবে'।" ব'লে কী হাসি যমুনার···

অকারণেই যমুনা যখন-তখন হাসে, তার ওপর ওর পক্ষে এমন একটা উপাদেয় কথা তো ওর হাসির খোরাক হবেই। কিন্তু হাসি থামার সঙ্গে-সঙ্গে আবার এমন দুঃখ করতে পারে যমুনা···বললে, "দুঃখ হলো ভদ্রলোকের উন্মাদ বউটির কথা শুনে। সত্যি, বিবাহিত-জীবন সুব্রতবাবুর যে মোটেই সুখের হয়নি, তা তাঁর প্রতিটি কথার হাব-ভাবে স্পষ্ট প্রকাশ হয়েছিল সেদিন। একটা কথা তিনি গোপন করলেও কৌশল ক'রে জেনে এসিছি, সামনের হপ্তায় শনিবারের ভোরে ভদ্রলোক আমেরিকায় যাচ্ছেন তাঁর উন্মাদ বউটিকে নিয়ে। সেখানে নাকি উন্মাদ রোগী সারাবার নতুন এক অব্যর্থ 'সায়েন্টিফিক্' উপায় আবিষ্কার হয়েছে।"

ব'লে খাতাখানা হাতে নিয়ে ওঠবার সময় যমুনা বললে, "কি আনন্দ নিয়ে যে আজ উঠছি ভাই শুভ্রা। ভগবানকে ডাকো, যেন এই আনন্দের অতলেই ডুবে থাকতে পারি আমরা দুই বোন্ আমাদের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত। আচ্ছা, আসি ভাই আজ। রোজই আমি সন্ধ্যের পর একবার ক'রে তোমার কাছে আসবো, কিভাবে এগুচ্চে আমাদের কাজ তার রিপোর্ট দিতে।"

শুভ্রজা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল কিছু বলবার জন্যে তাই যমুনার শেষের কথাগুলো সব ওর কানে গেল না; বললে, "আমি একটা পরামর্শ করতে চাইছিলেম তোমার সঙ্গে প্যাম্—মানে যমুনা, শুনে ভালো ক'রে ভেবে ছ্যাখো, সেটা করা আমাদের পক্ষে সমীচীন হবে কি না। আমি বলছিলেম, আজ তো শনিবার···সামনের শনিবারে দম্‌দম্ এরোড্রোমে—"

এই পর্য্যন্ত শুনেই হঠাৎ এত জোরে জিভ কেটে ফেললে যমুনা, যে, আর-একটু হলেই রক্ত বেরুতো। তারপর সেটা সাম্‌লে নিয়ে বললে, "ছি ছি, সাধ ক'রে কি বাড়ীর ছেলেগুলো, বোনেদের একটু খুঁত পেলেই 'ভোঁদা-মেয়ে' ব'লে বিনুনি ধ'রে নাড়া দেয়? ঠিক করে।" ব'লে দেয়ালের দিকে চেয়ে মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে সুব্রতকে উদ্দেশ ক'রে এমন ব'কে যেতে লাগলো যে, সুব্রত যেন দেয়ালে পিঠ দিয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে ওর কথা শুনছে!···বলতে লাগলো, "কি অন্যায় কাজ ক'রে ফেলিছি বলুন তো? জপিয়ে-সপিয়ে আপনার কাছ থেকে দু-চার টাকা নয়, একেবারে কুড়ি হাজার টাকার একখানা চেকে দস্তখত করিয়ে নিয়ে তারপর বেমালুম হাওয়া! আপনি কোথায় রূপকথার রাজপুত্রের মতো আমাদের রাজ্য থেকে উড়ে উড়ে সাতসমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে সেই যাদুকরীর দেশে চলেছেন তাঁদের যাদু-কাঠির ছোঁয়াচ দিয়ে আপনার আধ-ঘুমন্ত রাজকুমারী-বউটিকে সজাগ ক'রে তোলবার জন্যে, আর আমি

এখান থেকে এইটুকু ঘরের গাড়ীতে চেপে দম্‌দম্‌-এরোড্রোমে গিয়ে শ্রদ্ধায় আপনাকে অভিনন্দন জানিয়ে আসবো সামান্য কিছু ফুল দিয়ে···বিদায়ের ক্ষণে হয়তো-বা দু'-ফোঁটা অশ্রু উপহার—"

'অশ্রু উপহার' শুনে শুভ্রজা চম্‌কে উঠে দেখে নিলে, যমুনা ওর এই চম্‌কানো-ভাবটা লক্ষ্য করেছে কি না। কিন্তু কে কার দিকে লক্ষ্য করে তখন···যমুনা আপন মনেই ব'লে চলেছে···"দিয়ে আসবো, এটুকুও মনে পড়লো না আমার, এমন অকৃতজ্ঞ আমি। আর কবে জ্ঞানবুদ্ধি হবে আমার ?"

যেন এতক্ষণ পরে মনে পড়লো যমুনার, যে ওর পেছনে শুভ্রজা ব'সে আছে। দুষ্টু হাসি হাসতে-হাসতে বললে, "সেই ভালো শু, শনিবার ভোর পৌনে-ছ'টায় ওঁদের প্লেন ছাড়বে তো ? তাহলে তার আগেই আমি গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়বো এরোড্রোমের দিকে দম্‌দমে। তুমিও ঐ সময় যেও—কেমন ?"

শুভ্রজা বললে, "আমাকে তো আর বলবার সুযোগ দিলে না ভাই। তার আগেই 'অডিটোরিয়ম'-এ ব'সে—তোমার স্বগতোক্তিটা সবই শোনবার সুবিধে ক'রে দিয়েছো আমার। কিন্তু যে-কথা আমার মুখ থেকে শোনবার জন্যে তুমি মাঝের কতকগুলো কথা উহ্য রেখে গেলে, এমন কোনো লজ্জার কারণ ঘটেনি যে, সে-কথাগুলো প্রকাশ করতে আমি সঙ্কুচিত হবো। শোনো। তোমায় আর একলা যেতে হবে না। তুমি বরং তোমার 'এলার্ম'-ঘড়িটায় দম দিয়ে রেখো যাতে সময়ে 'রেডী'

হতে পারো, আমি যথাসময়ে আমার গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে তোমাদের বাড়ী থেকে তোমায় তুলে নিয়ে যাবো এরোড্রোমে। তা-ছাড়া শনিবারের তো এখনো ছ'দিন দেরী আছে, আর রোজ সন্ধ্যের পর তুমি আসছোও এখানে। সেদিনের কথা তার আগের দিন সন্ধ্যেয় বসেই ঠিক করা যাবে'খন। কেমন? আমার মুখ থেকে যা শুনতে চাইছিলে, শুনলে তো? খুশী হয়েছো তো সুব্রতবাবুকে আমি বিনা-আমন্ত্রণে অভিনন্দন জানাতে যাবো শুনে?"

যমুনার চালাকি ধরা প'ড়ে গেছে শুভ্রজার কাছে।

ছ'জনেই ওরা এবার একসঙ্গে হেসে ফেললে…নীরব বোবা-হাসি।

যমুনা চলে গেল সেদিনকার মত।

*

* *

দিনের আলো তখনো উজ্জ্বল হয়নি। শুকতারার জ্বল-জ্বলে প্রভাকে নিষ্প্রভ ক'রে পূর্ব্বাশায় বর্ণ-বৈচিত্র্যের ছটা সুরু হয়েছে এমন সময় মোটর এসে থামলো দম্‌দম্ এরোড্রোমে, ওয়েটিংরুমের দরজার সামনে।

গাড়ীর দরজা খুলে আগে নামলো সুব্রত, তারপর ভেতরের

'সিট' থেকে বেরুলেন যতীন্দ্রনাথ, আর মেয়ের হাত ধ'রে চন্দ্রিমাদেবী।

ওদের কৌচ থেকে একটু তফাতে আর-একটা কৌচে ব'সে সুব্রত ভাবলে, কোনোরকমে খবর পেয়ে শুভ্রজা যদি এসে পড়ে এখানে? মতিলালকে তো বিশ্বাস নেই! সব-রকম অপ্রিয় ব্যাপারে অসাধ্যসাধন করতে ওর মত ফাজিল ছোকরা এত-বড় দুনিয়ায় বোধ হয় শুধু ও একলাই আছে। সে যদি জানতে পারে ওর আমেরিকা-যাত্রার কথা…

আর জানতে পারে! সুব্রতর চোখের সামনে ওর একখানা চেনা-মোটর এসে থামলো যে! ঐ তো নামছে, আগে যমুনা, তার পেছনে শুভ্রজা।…'যাদৃশী ভাবনা যস্য'।…হ্যাঁ, ওকে অপ্রতিভ করবার জন্যে মতিলালই খবর দিয়ে ওদের এখানে এনে নিজে কোথাও লুকিয়ে ব'সে আছে, তারপর যথাসময়ে দাঁত বের ক'রে হাসতে-হাসতে—নির্লজ্জ কোথাকার…

এই যে ওদের কিছু না জানিয়ে গোপনে স্ত্রীকে নিয়ে আমেরিকা পাড়ি দেয়া…সামনাসামনি এখুনি তো দেখা হবে। তখন কি করবে সুব্রত?…

সুব্রত কি করবে ব'লে শুভ্রজা আসবে না নাকি দুস্তর জলধিপারের অভিযাত্রী বিমানবিহারিকে বিদায়বেলায় দুটো ব্যথার বাণী শোনাতে বা অভিনন্দিত বন্ধুকে দু'ফোঁটা অশ্রু উপহার দিতে!…

বিমান-বিশ্রামাগারে ঢুকে যমুনা ও শুভ্রজা মাথা নীচু

ক'রে প্রথমে যতীন্দ্রনাথকে তারপর চন্দ্রিমাদেবীকে অভিবাদন জানালে। গঙ্গোত্রীকে দেখে শুভ্রজার মনে হলো, হোক্ উন্মাদ, কি সুন্দর চেহারা। আমার চেয়ে ওকে দেখতে—দেখতে ওকে আমার চেয়ে অনেক ভালো।···

চন্দ্রিমাদেবী বললেন গঙ্গাকে, "প্রণাম করো গঙ্গা, তোমার স্বামীর এই বান্ধবী দুটিকে।"

গঙ্গা শুনলে মার কথা। এখন ওকে দেখে কেউ আর বলতে পারবে না যে ওর মাথার দোষ আছে। শুভ্রজা ভাবলে, সবাই যে একে পাগল বলে, কৈ, উন্মাদের লক্ষণ তো কিছু দেখছিনে এর মধ্যে!

সুব্রত তখন কৌচের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফুলের গুচ্ছে হাতজোড়া ছিল যমুনার, আর মালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল শুভ্রজা তাই এতক্ষণ অভিবাদন জানতে পারেনি সুব্রতকে, এবার শুভ্রজার ইঙ্গিতে সুব্রতর হাতে ফুলের তোড়াটি দিয়ে ওকে নমস্কার করলে যমুনা, আর তারের বড় মালাটি গঙ্গার হাতে দিয়ে মৃদু হেসে শুভ্রজা বললে, "এ মালাটা তোমার বরের গলায় পরিয়ে দাও তো ভাই!"

গঙ্গা এসব কিছু বুঝতে পারে না, মার দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে থাকে···মা বলেন, "তাই দাও না, তাতে দোষ নেই।"

বিমান-যাত্রী তখন জমেছে অনেক। অত লোকের মাঝে

গঙ্গা স্বামীর গলায় মালা পরিয়ে দিতে, দারুণ লজ্জায় শুভ্রজার দিকে আর চাইতে পারলে না সুব্রত।

এতক্ষণ পরে সুব্রতকে ছোট একটি নমস্কার জানিয়ে, গঙ্গার দিকে এগিয়ে গিয়ে, যমুনার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে—ডালায় অনেকগুলো ইংলিশ-কাট্ হীরে সেট্-করা সোনার একটা সিঁদুরকৌটো বের-ক'রে, তাই থেকে একটিপ্ সিঁদুর তুলে নিয়ে গঙ্গার মাথার সিঁথিতে আর হাতের লোহায় দিতে-দিতে শুভ্রজা বললে, "বিয়ের সময় যেতে পারিনি তাই আজ যৌতুক করলেম তোমায় এই সিঁদুর কৌটোটি।···চিরায়ুষ্মতী হও, আবার ফিরে এসো ভালো হয়ে স্বামীর সঙ্গে, বেঁচে থাকি তো সেদিনেও আবার আসবো আমি···"

ক-হাজার টাকা দাম হবে এই জড়োয়ার সিঁদুর কৌটাটার সে-কথা কি কাউকে জানাবে শুভ্রজা ?···

না জানালেও আমরা আন্দাজ করতে পারি, অন্তত আট হাজার টাকার কম হবে না।

সিঁদুর কৌটোটি গঙ্গার হাতে দিয়ে, চন্দ্রিমাদেবীকে আবার প্রণাম ক'রে শুভ্রজা আর যমুনা গিয়ে দাঁড়ালো এরোড্রোমের খোলা চাতালের প্রান্তে রেলিং ধ'রে।

প্লেনে তখন সিঁড়ি লাগানো হচ্ছে। যাত্রী বোঝাই হলেই তাদের নিয়ে আকাশে উড়ে যাবে বিরাট ডানা মেলে···

সুব্রত এগিয়ে চললো সকলকে যার যা প্রাপ্য-সম্মান জানিয়ে, গঙ্গাকে সঙ্গে নিয়ে প্লেনের কাছে।

সেখানে গিয়ে সুব্রত ওদের দিকে ফিরে দেখতেই গঙ্গোত্রী জিগেস করলে, "ওরা কারা গা ?···ওই ছুটো মেয়ে ?"

সুব্রত বললে, "ওই বাঁদিকে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন রেলিং ধ'রে, উনি জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর মানসকন্যা, আমার চিরবান্ধবী শুভ্রজা। মানে—সরস্বতী।"

গঙ্গোত্রী বললে, "আর ওর পাশে ?"

সুব্রত বললে, "উনি শুভ্রজার বোন···বিজ্ঞানের ছাত্রী···ওঁর নাম যমুনা।"

এবার নিজের বুকে হাত দিয়ে গঙ্গোত্রী বললে, "আর আমি ?"

সুব্রত বললে, "তোমাকে জ্ঞান দেবার জন্যে তোমায় নিয়ে যাচ্ছি আমি এক বিজ্ঞানের দেশে, তুমি গঙ্গা।"

তারপর সুব্রতকে দেখিয়ে গঙ্গোত্রী বললে, "আর—তুমি ?"

সুব্রতর কি নিস্তার আছে গঙ্গার কাছে ?···বললে, "আমি গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর পুণ্য-পবিত্র জলে স্নান ক'রে সেই পুণ্যে তোমায় পেয়েছি, আমি সুব্রত—তোমার স্বামী।"

"স্বামী, না আমার গোস্বামী ?" বলেই সুব্রতর মুখের দিকে চেয়ে গঙ্গোত্রী খিল্‌খিল্‌খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠলো···

শুভ্রজার চোখে অশ্রু আছে কি না অত দূর থেকে ঠিক বোঝা গেল না।

ইতি—

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী,
শ্রীকিরীটিকুমার পাল